KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication: ১৫৭-২ কালীঘাট 43 রোড, কল-৩৮
Collection: KLMLGK	Publisher: সুরেশ সরকারপুত্র
Title: আবহ	Size: 5"x8" 12.70x 20.32 c.m.
Vol. & Number: ২	Year of Publication: ১৩৭২
	Condition: Brittle Good
Editor: রমেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাই কর্মকার	Remarks:

CD Roll No. KLMLGK

আখর

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আ খ র

ত্রিমাসিক সাহিত্যপত্র

নবম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা

তেরশ বাহাত্তর

বিষয় সূচী

বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন। ভাষা সমস্যা, রবীন্দ্র-চিন্তা এবং আজকের দাবী। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে। শেক্সপীয়রের উদ্দেশে। শেক্সপীয়রের সনেট। হৃদয় সম্পর্কিত। দর্শন। মাছের কথা। সাহিত্যে পুরস্কার। ডিয়েৎনাম। বোবাকাহিনী ও জীবন কথা। আলবার্ট শোআইৎসার। আরক-পাঠক-আসর।

লেখক সূচী

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হিতেন ঘোষ আনন্দ বাগচী অমর ভট্টাচার্য্য

শেক্সপীয়র

সুভাশিস গোস্বামী চয়ন সেনগুপ্ত অমলেন্দু ঘোষ নিবারণ চক্রবর্তী বরুণ রায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক-সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়মরক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে

ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান্ কোটেশন্ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।...

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

** উপরের রচনাটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। রচনাটি 'প্রচার' নামক পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে (১৮৯২) অন্তর্ভুক্ত হয়।

কেবল নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার বা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পুনর্মুদ্রণের দ্বারা পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আজ ৮০ বছর পরে রচনাটি সংকলিত হয় নি। মহাপুরুষ-বচনের যান্ত্রিক ও অনান্তরিক উদ্ধৃতি কেবল নিরর্থক নয়, গুরুতর অপরাধ। রীতিরক্ষার তাগিদে মহাজনের শরণ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হবে আর জীবন-রক্ষার দোহাই দিয়ে অসদাচরণ অনুসরণ করা হবে—বর্তমান কালের এই গর্হিত নীতিকে 'আখর' স্বীকার করে না। উপরের রচনাটি আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে 'নিবেদন' করা হলেও আজও এর উপযোগিতা পূর্ণ মাত্রায় আছে এই বিশ্বাসে নিবেদনটিকে আখরের পুরোভাগে মুদ্রিত করা হল।

রচনাটি পাঠ ক'রে পাঠক যেন বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মতবাদের প্রতি সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়েই আপন কর্তব্য সম্পাদন না করেন। বর্তমান সাহিত্য পত্র ও সংবাদপত্র-সমাজে বহু ক্ষেত্রেই এই নিবেদনোক্ত নীতির প্রতিকূলতা করা হয়ে থাকে। হয় তাঁরা এই নীতিসমূহ অনুসরণ করবেন, নয় মহাজন নামের শরণ নেবেন না—সাহিত্যে কাপট্যের কোনো স্থান নেই আখরের এই বিশ্বাস ও ব্রত

ভাষা সমস্যা
রবীন্দ্র-চিন্তা এবং আজকের দাবী

"প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কেবল বিলাতি বিদ্যার একটা বালির চর বাঁধিয়া দিয়াছিল; সে বালুকা রাশি পরস্পর অসংসক্ত; তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণধারণের জন্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাংলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা এক হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাংলা-হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন সেই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তানসমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

সেই জন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? কারণ, শিক্ষাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা, যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরানিগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে। সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন ব্যতীত এ-কার্য কখনো সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি, দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, সর্বসাধারণের নিকট নিজের কর্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনো

আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।"

বাংলা জাতীয় সাহিত্য

"আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষপর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।" সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।"

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

"একত্র সংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই। যে দেশে আছে সেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না; কারণ, যেখানে অনুভব শক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্বসাধারণে ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জার্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমনকি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন ও জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে, প্রজা সংখ্যা তুলনা

করিলে জর্মানি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষাশালা নাই এবং সেই সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরি-ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বয়ং তরবারি হস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তি স্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।"

সাহিত্যের গৌরব

"কিন্তু বৃথা এ-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা। আমাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যেদিকে ফিরানো যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার এবং পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন; তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্য শরীরকে বিলাতি অশনবসনের সহিত সংসক্ত করিতে চাহেন না; কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্যে পরিবর্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপবোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম' বাংলাভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তিমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝানো কঠিন যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

• কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহিনা। ইংরাজির প্রতি এই পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য, আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ

সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইঁহার প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখনো কখনো স্থান পাইয়া থাকি, আবার কখনো কখনো কর্ণপীড়নও লাভ হয়—সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর, আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি, আমাদের দরিদ্র বাংলা ভাষা, পাকশালার কাজ করেন—সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যক কাজ আর আমাদের আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নবকুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এই জন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি; প্রশ্ন করিলে বলি, চিনিনা।

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারেনা, সে কেবলমাত্র ভালোবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালোবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোন পরিচয়-প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালোবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালোবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে যে, পদমান প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ।"

বাংলা জাতীয় সাহিত্য

** সম্প্রতিকালে এদেশে ভাষা সমস্যা নিয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। আজ যে-সমস্যাটি অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে সেটি সমগ্র সমস্যার একটি অংশমাত্র। আজ যাঁরা এ নিয়ে হৈ চৈ করছেন তাঁরা ধরে নিয়েছেন সমস্যার বাকি অংশটুকুর সমাধান হয়ে গেছে, এখন শুধু রাষ্ট্র ভাষা বা সরকারী ভাষার ব্যবস্থা নির্ণয় হয়ে গেলেই চুকে যায়। কিন্তু বস্তুত পক্ষে রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষার সমস্যাটি একটি বৃহৎ সমস্যার অংশ মাত্র এবং এটি অন্তিম অংশ। এর পূর্বের সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান হলে এটি অনেক সহজ ও স্পষ্ট হয়ে আসবে। সমগ্র সমস্যার বাকি অংশে আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচলন এবং সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলন। এ-গুলির সঙ্গে রাষ্ট্র-ভাষা বা সরকারী ভাষার সমস্যাটি অবিচ্ছেদ্য। এ সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থেকে ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যা যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তা বুঝতে পারি

যখন দেখতে পাওয়া যায় যে সাম্প্রতিক বাদানুবাদের বহুকাল পূর্ব থেকেই অনেকেই এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও এর আলোচনা প্রথম শুরু হয় বোধহয় বাংলা দেশে। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত ও প্রয়াস এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইতিহাস চারণের নিয়মরক্ষার খাতিরে নয়, অন্য কারণেও এই সব মত ও প্রয়াসের কথা স্মরণযোগ্য। আলোচনা প্রাচীন হলেই তার সিদ্ধান্ত অবশ্য-গ্রহণীয় এ যুক্তি নিতান্তই অচল, আবার ১৯৪৭ সালের পর সমগ্র পরিপ্রেক্ষা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে সুতরাং পূর্বসূরীদের চিন্তা আলোচনারও অযোগ্য এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও সম্প্রতিকালে অনেকে এই দ্বিতীয় কুযুক্তির জোরে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত অগ্রহণীয় বলে প্রচার করছেন। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে পরিপ্রেক্ষা পরিবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য এবং অন্যান্য অনেক মত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য ব'লে স্বীকৃত হলেও ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত কিছুতেই আর চলবে না—এই কুযুক্তি মতলববাজের সুবিধাবাদ। ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মূলানুসন্ধানী। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল যাতে তাঁর চিন্তার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়। প্রয়োজনে অন্য অবসরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা অন্যান্যদের চিন্তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে।

ভাষা সমস্যা নিয়ে সাম্প্রতিক চিন্তার অস্পষ্টতা ও অবাস্তবতার প্রধান কারণ দেশ কালের সঙ্গে অপরিচয় এবং সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধি। যাঁরা দেশকে চেনেন নি এবং ভালবাসেন না তাঁদের মুখে অনেক অবাস্তব সমাধানের প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। এঁদের অজ্ঞতার সঙ্গে আছে নিদারুণ স্বার্থ বুদ্ধি। পূর্বেই বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষার সমস্যাটি এক বৃহৎ সমস্যার অংশ মাত্র। বৃহৎ সমস্যাটি সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আংশিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে এ দেশে শতকরা প্রায় সত্তর জন অক্ষর জ্ঞান-শূন্য অর্থাৎ মাতৃভাষা, হিন্দি বা ইংরেজি কিছুই তাঁরা পড়তে পারেন না। সুতরাং ভাষা সমস্যাটি তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরে। যে-ভাষা সমস্যা নিয়ে উপর মহলে এত কলহ প্রতিবাদ দেশের জনসংখ্যার শতকরা সত্তরজনের সে-সমস্যায় কোনো অধিকার বা আগ্রহ নেই। এই সত্যটিকে বাদ দিলে যে-কোনো সমাধানই ভ্রান্ত ও স্বার্থ-দুষ্ট হতে বাধ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে দেশের ভাষা সমস্যাটি আসলে

ভবিষ্যতের সমস্যা—যে-ভবিষ্যতটি আগে তৈরি করতে হবে, তা নইলে সমস্যাটি সমাধান হবে কিভাবে? যে-সত্তর জন অক্ষর পরিচয় থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত করার দায়িত্ব আগে নেওয়া হোক। তা নাহলে রেল স্টেশনের নাম বা ডাক টিকিটের দাম চৌদ্দ কেন একশো চল্লিশটি ভাষায় লিখে দিলেও ওই সত্তর জনের কোনো সুবিধা হবে না।

শুনতে পাই আমাদের সংবিধানে সার্বজনীন শিক্ষার পবিত্র দায়িত্ব স্বীকৃত আছে এবং সে দায়িত্ব পালনের এক সময়-সীমাও নির্ধারিত ছিল এবং সেই সময়-সীমা নাকি অতিক্রান্তও হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য পবিত্র দায়িত্ব পালন করা হয় নি, এবং সেজন্য সরকারকে বিশেষ লজ্জিত বা চিন্তিত মনে হয় না। বরং সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান গতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চললে এ দেশে সার্বজনীন অক্ষর পরিচয় সম্পূর্ণ হতে আরও একশো বছর লাগবে। এর চেয়ে নির্লজ্জ ঘোষণা আর কি হতে পারে জানি না। এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও নির্লজ্জ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা সমস্যাটিকে বিচার করা প্রয়োজন। যে কোনো সভ্যদেশে যেটুকু ন্যূনতম প্রত্যাশা তার জন্য এক শতাব্দী প্রতীক্ষা করা হবে কিনা তা দেশবাসীর বিচার্য। আমরা ভাষা সমস্যা বলতে মৌন ম্লান মূক মুখে ভাষা যোগানোর সমস্যাকেই বুঝি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ভাষা কি হবে তা বাহ্য।

আমরা মনে করি আগামী দশ বছরের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে শতকরা সত্তর জনকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হোক—কেবল সংবিধানে লিখে বা প্রস্তাব পাশ করে নয়, যে অর্থব্যয় ও দ্রুততার সঙ্গে স্কুলে কলেজে এন সি সি প্রচলন করা হয়েছে তার চেয়ে দশগুণ অধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রত নিতে হবে—তাতে দেশরক্ষার নিশ্চয়তা পঞ্চাশ গুণ বাড়বে নিঃসন্দেহে।

আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে এই একই কারণে উন্নত করা হোক—যাতে সবাই মাতৃভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগুলি উন্নত হলে এবং অন্ততঃ শতকরা সত্তর জন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হলে ভাষা সমস্যাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা নিয়ে দেখা দেবে। ততদিন সর্ব ভারতীয় পরীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের অবস্থাই বজায় রাখা হোক। তাতে এমন কিছু ক্ষয় ক্ষতি হবে না।

অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রে একটা সর্বভারতীয় ভাষার উপযুক্ত অনুবাদ বিভাগ রাখতে হবে, তাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে-রাজ্যে যে-ভাষা

প্রচলিত সেই ভাষায় অনুবাদ করে পাঠাবেন, কেন্দ্রের হুকুমনামা প্রচারের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সকল ভাষার সমান মর্যাদা দেওয়া হবে মায় ইংরেজি পর্যন্ত। প্রত্যেকে জানুক তার মাতৃভাষায় যথার্থ মর্যাদা আছে। মাতৃভাষা জানলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

গোড়ার সমস্যা প্রথমে না ধরে মাঝখান থেকে সমাধান করা যায় না। যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার প্রথমেই তার মাথা ধরার ব্যবস্থা করার আগে তার দেহ পুষ্ট ও রোগ বীজাণু নাশের চেষ্টা করতে হয়।

আর দুটি কথা, প্রশ্ন উঠেছে ইংরেজির কি হবে। আমরা বলি ইংরেজি তার আপন মহিমায় আপন মর্যাদা আদায় করবে। দেশে শিল্প বিস্তার হোক, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চা হোক, দেখা যাবে ইংরেজি অপরিহার্য বিবেচনাতেই এদেশে একটি স্থান করে নিয়েছে। ইংরেজিকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত হতে হবে না, জোর করে তাড়াতেও হবে না। দেশের সত্তর জন মূর্খ থাকবে, আর তিনজন ধনী সন্তানের বিলেতে উচ্চ শিক্ষার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ইংরেজিকে আঁকড়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করা হোক, হয়তো একদিন দেখা যাবে ইংরেজি আপনিই তার মর্যাদা চ্যুত হয়েছে। অন্য বহু দেশে এ ঘটনা ঘটেছে। শিল্প বিস্তার, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা প্রচুর পরিমাণে বাড়লে ইংরেজি কেন জার্মান, রাশিয়ান ভাষাও ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠতে বাধ্য। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজির ওপর বেশি জোর দেওয়া হোক স্কুল কলেজ থেকে। কারণ যতদিন পর্যন্ত না ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হচ্ছে, ততদিন তাদের ইংরেজি থেকেই অধিকাংশ জ্ঞানবিদ্যা সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়ের যেই স্তর থেকে বিজ্ঞান আসবে, সেই স্তর থেকেই ইংরেজি রাখা হোক। অন্য বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজি অতখানি অপরিহার্য নয়। ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব যাঁরা করেন দেশের সঙ্গে তাঁদের বিন্দু মাত্র পরিচয় নেই, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে ইংরেজ সরকার একশো নব্বই বছরের চেষ্টায় এদেশে শতকরা দুজনকে ইংরেজি শেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, হিন্দি প্রসঙ্গে। সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষার ক্ষেত্রেই (link language) হিন্দির কথা উঠতে পারে, সরকারী যোগাযোগ নয়, সাধারণের যোগাযোগ। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অঞ্চলে এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে হিন্দি প্রচলিত রয়েছে এটা সরকারী চেষ্টায়

এত না হয়েছে—প্রয়োজনের তাগিদে তার চেয়ে বেশি হ'য়েছে—সরকারী চেষ্টা তো শুরু হয়েছে ১৮ বছর ধরে। হিন্দির প্রচলন অন্তত গত পঞ্চাশ বছরের উপর—ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়লে মনে হয় এক শতাব্দী ধরে। হিন্দি সেই স্বাভাবিক গতিতেই ছড়িয়ে পড়ুক তাতে কেউ আপত্তি করবে না। মাত্রাধিক সরকারী দাক্ষিণ্যেই আপত্তি। হিন্দিকে স্বাভাবিক গতির উপর ভরসা করে ছেড়ে দিলে হিন্দির প্রচলন বাড়বে বই কমবে না কারণ ইতিহাসের সাক্ষ্য হিন্দি প্রচলনের সপক্ষে। সরকারী দাক্ষিণ্যই হিন্দি বিরোধিতা বাড়িয়েছে। নইলে হিন্দি প্রয়োজনের তাগিদেই এত দিনে এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে link language হয়ে যেত, অন্ততঃপক্ষে উত্তর ভারতে।

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে

শ্রীবিভেন ঘোষ

বর্তমান বছরের ছাব্বিশে জানুয়ারী নিঃসন্দেহে একটি অন্ধকার দিন। হিন্দী ভাষাকে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সরকারী প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সেদিন সমস্ত দক্ষিণ ভারতে এবং বিশেষ করে মাদ্রাজে গণবিক্ষোভের প্রচণ্ড আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো। বেশ কিছু দিন ধরে সেই আগুন জ্বলেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মানুষের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে সেই আগুন আপাতত ছাই চাপা পড়েছে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে এই বিক্ষোভ আর প্রতিবাদের আগুন ছাইচাপা পড়লেও সমস্ত ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় সেই ছাই চাপা আগুনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে নানান দিক থেকে ভাষা সমস্যাকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে।

সরকারী মহলের একটা প্রভাবশালী অংশ যে এক রকম জোর করে ভারতবর্ষের ঘাড়ে হিন্দী ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়দের বহু কাঠ খড় ও কেরোসিন পোড়ানোর পর সে কথা আজ সমস্ত ভারতবর্ষের জ্ঞানগোচর হয়েছে। অনেক দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত যে এই সমস্যাটাকে আমরা তলিয়ে দেখতে সচেষ্ট হয়েছি এটা সুখের কথা। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে যাঁরা চিন্তা করছেন এবং বিভিন্ন ফরমূলা দেবার চেষ্টা করছেন মনে হয় তাঁরা এই সমস্যাটার আসল দিকটাকে এড়িয়ে গিয়ে সমস্যাটাকে সম্পূর্ণ রূপে একাডেমিক সমস্যা রূপে বিচার করছেন। অথচ জোর করে হিন্দী ভাষা যাঁরা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাকে ঠেকানোর জন্যে যাঁরা আগুন জ্বাললেন এই দুপক্ষের মনোভাব একটু তলিয়ে দেখলে এই সমস্যাটার মূলে যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের গভীরতম সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। গত সতেরো বছর ধরে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি যে ক্রমশ ভেঙে পড়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে আরো গভীরতর সংকটের মুখোমুখি হতে হবে এ কথা স্বীকার করতে আজ আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান ভাষা সমস্যার মূলেও সেই একই সংকটের কারণগুলো বিদ্যমান। আর তাই উত্তর হিন্দী নইলে মারমুখো আর দক্ষিণ হিন্দীর প্রতিবাদে মারমুখো। আসলে ভাষাটা উপলক্ষ মাত্র, উত্তর আর দক্ষিণ পরস্পরের উপরে ক্ষমতা বিস্তারের লোভে কাণ্ডজ্ঞানহীন এটাই আসল সত্য। উত্তরের হাতে ক্ষমতা আছে তাই সে নীরবে কার্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে চক্রান্তে লিপ্ত আর দক্ষিণের হাতে ক্ষমতা নেই তাই সে নিজের গায়ে আগুন জেলে প্রতিবাদমুখর।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে ভারতবর্ষের শতকরা তিরিশ জন মাত্র হিন্দীভাষী। কিন্তু হিন্দীওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা এমন একটা সংখ্যাতত্ত্ব দেখাবেন যার ফোলানো পেটের মধ্যে রাজস্থানের মানুষদের তো গেলা হয়েছেই এমন কি বাংলাদেশের জনসংখ্যাকেও গেলার চেষ্টা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, সে কি, আপনারা হাজারে হাজারে হিন্দী সিনেমা দেখছেন, সারা দিন আকাশবাণী থেকে হিন্দী গান শুনছেন, দিনান্তে অন্তত একবারও হিন্দী ভাষায় কথা বলছেন, আর জাতীয় ভাষা হিন্দী হলেই যত আপত্তি। আর যদি হিন্দী ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে এরপরও আপনার সাহস থাকে হয়তো হিন্দী সাহিত্য অথবা হিন্দী ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনার কথা জানতে চাইবেন। এ ব্যাপারে হিন্দীওয়ালারা কিন্তু খুব সহজ উত্তর দেবেন, সোজা গৌরী সেনের টাকার থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবেন, সব হবে, কিছু ভাবনা নেই।

ভাবনা তবু থেকেই যায়। কারণ এ দেশে সমস্যা তাড়ানোর চেষ্টাটা আসলে সমস্যা তৈরীর বিজ্ঞাপনের প্রচার। শতকরা তিরিশজনওয়ালাদের পক্ষের যুক্তিগুলো একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কেমন করে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাঁদের পক্ষের প্রথম যুক্তিটাই মারাত্মক—ভারতবর্ষের শতকরা তিরিশজন হিন্দীভাষী, অপর দিকে অন্য কোন ভাষাভাষী শতকরা তিরিশজন নয়, অতএব গণতন্ত্রের মেজরিটি হিন্দীওয়ালাদের হাতের মুঠোয়। তাঁদের পক্ষের দ্বিতীয় যুক্তিটি কিন্তু মোক্ষম—সমস্ত ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে একটি জাতীয় ভাষা নাকি নিতান্ত প্রয়োজন আর সেজন্যে প্রথম যুক্তি অনুসারে হিন্দী ভাষার দাবী অগ্রগণ্য। কথায় বলে, শয়তানেরও যুক্তি আছে। হিন্দীওয়ালাদের যুক্তি অনেকটা সেই রকম। তাঁদের আসল যুক্তি হ'লো হিন্দীর পক্ষে দিল্লী আছে। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকরের ভাষায় 'দিল্লী হলো হিন্দীভাষীদের মক্কা।' (উল্টো দৌড়, দেশ, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭১)

ঐ একই প্রবন্ধে অন্নদাশংকর আরো বলেছেন "ধর্মের ক্ষেত্রে বা ভাষার ক্ষেত্রে

অধিকাংশের ভোটই নিয়ামক নয়।" এবং তিনি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "এত বড়ো একটা দেশ একভাষী হতে পারে না। একভাষিক সমাধান সে অবাস্তব এটা কি আমরা কোন দিন হৃদয়ঙ্গম করবো না?"

অন্নদাশংকর মিথ্যেই দুঃখ করেছেন। কারণ হৃদয় থাকলে রাজনীতি থাকে না। আর রাজনীতি না থাকলে রাজ্য থাকে কি উপায়ে। এদেশে রাজ্য রক্ষার্থেই রাজনীতি, আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই সমস্যা সমাধানের অন্যতম লক্ষ্য। তাই এদেশে হৃদয় ছিল না বলেই নাথুরাম স্মরণীয় রাজনৈতিক বীর আর হৃদয় ছিল বলেই মহাত্মাজী গান্ধীবাদের মোহান্ত, তাঁকে পূজা যদি বা করা যায়, মেনে চলা অসম্ভব।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকরের লেখাতেই দেখতে পাচ্ছি মহাত্মাজী বলেছিলেন "The imperialist rule of the Englishman will go, because it was and is an evil. But the superior role of the English Language cannot go." দিল্লীওয়ালারা কিন্তু একথা মানতে রাজি নন। ইংরেজের যত নষ্টামি তাঁদের চাই কিন্তু ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইংরেজী ভাষায় তাঁদের প্রবল আপত্তি, কারণ ওটা সাম্রাজ্যবাদীর ভাষা। অতএব ইংরেজীকে উচ্ছেদ করা চাই। এখানেও আসল লক্ষ্য সেই এক—সারা ভারতবর্ষে হিন্দীওয়ালাদের মৌরসীপাট্টা জমানোর শেষ বাধা ঐ ইংরেজী ভাষাকে উচ্ছেদ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমরা কিন্তু ইংরেজীর পক্ষে। ইংরেজী ভাষা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আজ সম্পূর্ণ অন্য অর্থে অমূল্য সম্পদ। ইউরোপের আলো বাতাসের যেটুকু আমরা পেয়েছি সে ঐ পশ্চিমের খোলা জানলার দাক্ষিণ্যে। ঐ জানলাটুকু বন্ধ করে দিয়ে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের অবাধ দৌরাত্ম্যের সদর দরজা খুলে দিলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার।

কেউ যেন না মনে করেন আমরা ইংরেজী ভাষা কিংবা ইউরোপীয় সংস্কৃতির মোহে এ কথা বলছি। আমাদের ধারণা, হিন্দীর কাজ নয় ভারতবর্ষের মত বিচিত্র ও বহুভাষিক দেশের জাতীয় ভাষার সমস্যা সমাধান করা, ভারতবর্ষের কোন একটি ভাষার পক্ষেই সে দায় পালন করা সম্ভব নয়। অতএব ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ভাষাগুলোকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি ভাষাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠতে পারে। বাংলা ভাষার অসামান্য উন্নতির মূলে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী ভাষার কল্যাণে প্রাপ্ত ইউরোপীয় শিক্ষা

সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতের আলো বাতাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য। সেই কথা স্মরণ করে আমাদের বিশ্বাস ইংরেজী ভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা হিসেবে রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে যদি আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সর্ববিধ উন্নতির পথ খুলে দেওয়া যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অন্য ভাষাগুলোও প্রয়োজনীয় উন্নত মান অর্জনে সক্ষম হবে। এই কাজে ইংরেজী ভাষার সাহচর্য হবে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় কাজকর্ম ইংরেজী ভাষায় চালানোর অর্থই হ'লো সমস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সামনে সমান সুযোগ খুলে রাখা। কেন্দ্রের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির মাধ্যম ইংরেজী রাখলে বর্তমান অবস্থায় কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসবে বলে আমরা মনে করি যখন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ভাষাগুলিই যথেষ্ট উন্নতমান অর্জনে সক্ষম হবে—সেদিন অনায়াসে ভারতবর্ষের চৌদ্দটি প্রধান ভাষায় এক সাথে কেন্দ্রের কাজ কর্ম চালানো সম্ভব হবে।

হিন্দী ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার জন্যে যাঁরা সচেষ্ট হিন্দী ভাষার উন্নতি তাঁদেরও লক্ষ্য। সুতরাং ইংরেজী ভাষার সাহচর্য তাঁদেরও কাম্য হওয়া উচিত। কারণ হিন্দী ভাষা নিয়ে হিন্দীওয়ালাদের গর্ব যতই আকাশচুম্বী হোকনা কেন সে ভাষা যে কোন দিক দিয়েই উন্নত মানের ভাষা নয় সে কথা হিন্দী ভাষা প্রেমিকদেরই বোঝা উচিত সকলের আগে।

কিন্তু হিন্দী ভাষার ভবিষ্যত কিংবা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির ভবিষ্যত কোনটাই উন্মাদ হিন্দী প্রেমিকদের লক্ষ্য নয়। তাদের লক্ষ্য যে কোন প্রকারে গোটা হিন্দুস্থানকে হিন্দীস্থানে পরিণত করা। অন্তত গত ছমাসের টালবাহানা আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয়—যদিও এই চেষ্টা চলছে বহু দিন ধরে। জাতীয় সংহতির ভবিষ্যত নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া দিল্লীর নেতাদের দৈনিক কর্তব্যের অন্তর্গত। সম্প্রতি সম্ভবত মাদ্রাজের ঘটনার পর আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নয়নের জন্যে সরকারী প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, সমস্ত প্রধান ভাষাগুলোর উন্নতিবিধানে সমপরিমাণ সরকারী সাহায্যের কথা। কিন্তু কার্যত সরকারী সমজ্ঞানের যে নমুনা আমরা পাচ্ছি তার পরিচয় আছে ভাষা উন্নয়নের জন্যে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণের তারতম্যের মধ্যে। হিন্দী প্রচারের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ এক কোটি আশী লক্ষ টাকা আর বাকী সমস্ত জাতীয় এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোর জন্যে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র পাঁচকোটি তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা।

কিন্তু এহ বাহ্য। জাতীয় সরকার অবশেষে ভাষা সমস্যা সমাধানের একটি গণতান্ত্রিক নীতি আবিষ্কার করেছেন—তার নাম তিন ভাষা ফরমূলা। বলা হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে—ইংরেজী, মাতৃভাষা ও অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষা। হিন্দীভাষীদের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় ভাষাটি নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু অন্য ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় ভাষাটি হবে হিন্দী। আরো বলা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলি আপাতত ইংরেজী ভাষাতেই গ্রহণ করা হবে কিন্তু অহিন্দী ভাষীদের হিন্দী ভাষায় একটি পত্র পরীক্ষা দিতে হবে। এবং ১৯৭৫ সালের পর ইংরেজী ভাষাকে আর কেন্দ্রীয় যোগাযোগের বা পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাখা হবে না।

ভাষা সমস্যা সমাধানের এই সর্বরোগহর দাওয়াইটি ধুরন্ধর হিন্দীওয়ালাদের চমৎকার চক্রান্ত বুদ্ধির পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এর সারবস্তুটি এই, ১৯৭৫ সালের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে হিন্দী গেলানো যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ১৯৭৫ সালের পর ইংরেজীকে কুলোর বাতাস দিয়ে এদেশ ছাড়া করে দিয়ে আসমুদ্র হিমাচল হিন্দী-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই তিনটি ভাষা শিক্ষায় বাধ্য আছে। সেই তিনটি ভাষা হলো বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত। তার উপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অফুরন্ত পাঠ্যপুস্তকের চাপে তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের পথ প্রায় রুদ্ধ। এই অবস্থায় আরও একটি ভাষার চাপ তাদের সুকুমার মানসিক অবস্থাকে কোন্ পর্যায়ে এনে ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু দুঃখের কথা, বাংলাদেশে এই তিন ভাষা-নীতির বিপক্ষে যাঁরা জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তাঁরা সরাসরি এই তিন ভাষা-নীতিকে বর্জন করার কথা না বলে এই নীতির আংশিক অদল বদলের কথা বলছেন। তাঁদের দাবীগুলি এই রকম—বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রস্তাবিত তিন ভাষা নীতির বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের তাঁরা বিরোধী। তাঁরা মাতৃভাষা ও ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষাটি বাধ্যতামূলক করার বদলে ঐচ্ছিক করার দাবী জানাচ্ছেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে রক্ষা করার এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগের ভাষা অহিন্দীভাষী রাজ্যের জনগণের ভোটের মাধ্যমে স্থির করার কথা বলছেন (মাতৃভাষা সংরক্ষণ সমিতির বক্তব্য থেকে)।

কিন্তু এই বক্তব্য থেকে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার সমাধানের পর কোন্ অবস্থা স্থায়ী হবে তা স্পষ্ট করে বোঝা শক্ত। আমাদের বক্তব্য আমরা

আগেই বলেছি, আমরা চাই চৌদ্দটি প্রধান ভাষার সমান সুযোগ সুবিধা—এবং ইংরেজীর স্থায়ী আসন। একমাত্র এই অবস্থাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে দিলেই সমস্ত ভাষাগুলো সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারবে এবং তখন খুব সহজেই ঐ চৌদ্দটি ভাষায় একসঙ্গে কেন্দ্রের কাজকর্ম চালানো সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলো একসঙ্গে চৌদ্দটি ভাষায় চালানোর অসুবিধা অনস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে ইংরেজীকে সেই জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা আমাদের দাবীর মূল ভিত্তি হওয়া উচিত এই বহু ভাষিক দেশে কোন একটি মাত্র ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেবার প্রচেষ্টাকে ঠেকানোর দিকে লক্ষ্য রেখে। কারণ, "একটি দেশে যদি একাধিক ভাষা থাকে তবে কোন একটিকে রাজভাষা করলে সেই ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারাই রাজার জাত হয়। আর সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।" (অন্নদাশংকর)

কিন্তু এই সব শুভবুদ্ধির দ্বারা আমাদের জাতীয় সরকার সহজে পরিচালিত হবেন এমন মনে করা শক্ত। কারণ ভাষা সমস্যাকে যতই কেন না রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করা হোক এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ও শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের চক্রান্তকারী প্রচেষ্টা। এই চক্রান্ত বুদ্ধি কিছু নতুন নয়, বরং গত সতেরো বছর ধরে নানান ক্ষেত্রে এই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে একটানা। ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে আরও একবার তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এবং ভাষা যেহেতু ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের মত সুতরাং আশা করা যায় সারা দেশময় ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে আগুন ধূমায়িত তা সহজে নিভবে না।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সরকারের কর্ণধারদের এই কথা আমাদের বুঝিয়ে দিতেই হবে যে, ভারতবর্ষের মত একটি বিচিত্র দেশে জাতীয় ভাষা নির্বাচনের মত কাজটা নানান কারণে অত্যন্ত জটিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দুভাগ করে দিয়েও গত সতেরো বছরের ইতিহাসে এই ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে যে কলঙ্কজনক ঘটনাগুলো বার বার আমাদের জাতীয় সংহতিকে সংকটাপন্ন করেছে সেই ঘটনাগুলো ভারতবর্ষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত জটিলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং বার বার এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষের ঐক্য অনৈক্যের ঐক্য। কবির কাব্যে এবং দার্শনিকের স্বপ্নে যত উজ্জ্বল চিত্রই আঁকা হয়ে থাকুক না কেন তার যে একটা অনিবার্য অন্য দিক আছে এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ ঐক্যের উপর গুরুত্ব যত বেশি করে দেওয়া হয়েছে অনৈক্যের গুরুত্ব ততই স্মরণীয় হয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস এই ধারণার পক্ষেই রায় দেয়। বারে বারে, বিশেষ করে যখন

স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে তখন ভেদ বুদ্ধি যে কতটা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে বর্তমান অন্ধ্র রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাস থেকে শুরু করে গুজরাট-বোম্বাই বিরোধ, বাংলা-বিহার বিরোধ, আসামে বাঙালী নিধন যজ্ঞ কিংবা আলীগড় জব্বলপুরের কলঙ্কজনক ঘটনাগুলো তার সাক্ষী হয়ে আছে। এবং এ বছরের ছাব্বিশে জানুয়ারী সেই তালিকায় একটি স্মরণীয় সংযোজন।

দুঃখের কথা এই সব ঘটনা কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকারের স্বভাবকে বদলাতে সক্ষম হয়নি। এর কারণ খুব স্পষ্ট এবং রাজনৈতিক। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে গণতন্ত্রের খোল-নলচের আড়ালে শ্রেণী স্বার্থের বিকাশকে অবলম্বন করে। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে যতই সমাজবাদী সমাজ গঠনের উচ্চকিত ঘোষণার কথা বলা হোকনা কেন, মূলত গত সতেরো বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিন্নতর আকারে শ্রেণী শোষণের ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তাই স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাবলিক সেক্টরের গাল ভরা নামাবলীর আড়ালে ব্যক্তিগত মালিকানার শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত।

ফলতঃ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস নগ্ন ও নির্লজ্জ শ্রেণী শোষণের ইতরতায় কলঙ্কিত। আমাদের সাধারণ নির্বাচনগুলোর পর্দার অন্তরালে আছে সেই ভয়ংকর শ্রেণী শোষণ আর ভেদ বুদ্ধির নির্লজ্জ ছুরিশানানোর ইতিহাস। গণতন্ত্রের হাড়িকাঠে নরবলি দেবার চমৎকার কশাইখানা হলো ভারতবর্ষ আর তার গণতান্ত্রিক নির্বাচন। সেখানে ধর্মের ছুরি, জাতের ছুরি, দেশের ছুরি, ভাষার ছুরি—অর্থাৎ ছুরি শানানোর অন্ত নেই। আর মজার কথা হলো আমাদের ঘৃণার ছুরিতে ফসল কেটে ঘরে তুলছেন টাটা আর বিড়লা, পট্টনায়ক আর কৃষ্ণমাচারীর দল।

অতএব ভবিষ্যত ভারতবর্ষের কপালের উপর ডেমক্লিসের খড়্গের মত যে বিপদটা ঝুলছে সেটা হলো একটা কাচের গ্লাস হাত থেকে টুপ করে পড়ে যাওয়ার পরের অবস্থার সম্ভাবনা। আর এই হ'লো ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা নির্বাচনের মত জটিল সমস্যার প্রকৃত পটভূমি। জাতীয় ভাষা নির্বাচনের আগে তাই আমাদের জাতীয় সরকারের সামনে যে প্রশ্ন তুলে ধরা প্রয়োজন তাহলো ভারতবর্ষের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন অথবা শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যত মঙ্গল বিসর্জন—কোন পথটা তাঁরা বেছে নেবেন ?

শেক্সপীয়রের উদ্দেশে

শ্রীআনন্দ বাগচী

নাট্যকার বসে আছ কোন্ রঙ্গমঞ্চের ভিতর।

নাচের পুতুলগুলি ঘোরে ফেরে গল্পের সুতোয়
আলো থেকে অন্ধকারে, অন্ধকার থেকে অন্তরালে
জন্ম-মৃত্যু বিরহের সিঁড়ি ভেঙে, উইংসের পর্দায় হাত রেখে
নানা দৃশ্যে অঙ্কে দ্রুত ঘুরপাক খেয়ে, পথে পথে
পদচিহ্ন ধূলি ক'রে রেখে যায়, কণ্ঠস্বর চূর্ণ ক'রে ফেলে
বাহুদে ঝলসে নিয়ে ক্লান্ত হৃদপিণ্ডের বেদনা
সমস্ত নিকট-দূর, দীপ্তি দাহ, বুকের দোসর
বারবার হারায় বুঝি নতুন ক'রে ফিরে পাবে ব'লে,
নিজেকে নায়ক ভাবে কৃতবিদ্য নট, কাহিনীর
উদ্যোক্তা, যেহেতু খেলছে ঘটনায় দুর্ঘটনায়।

নাট্যকার! তুমি আছ অন্তরালে মঞ্চের ভিতর॥

ইলিয়ম শেক্সপীয়র

সনেট ৭৭

Thy glass will show thee how thy beauties wear

দেখো মুকুরে বিম্বিত হতে তোমার লাবণ্যের অবক্ষয়,
ঘড়িতে প্রতীত হতে মহার্ঘ কালের নিঃসরণ।
প'ড়ে-থাকে তোমার চিত্তের চিহ্ন শুধু ক'টি নির্জন পাতায়,—
এ-গ্রন্থের আনুকূল্যে উক্ত শিক্ষা ক'রো আস্বাদন।
অবিকল প্রতিচ্ছবি আঁকে জরা তোমার মুকুরে,
দেখো তুমি মুখোমুখী উদ্বিগ্ন মৃত্যুর হাতছানি;
ঘড়ির তমিস্র বৃত্তে লক্ষ্য করো নিঃশব্দ সঞ্চারে
কেমনে তস্কর কাল অনন্তের অভিধা-সন্ধানী।
তবে হও এবম্বিধ,—স্মৃতি যার অশক্ত ধারণে,
সে-সবে উজাড় করো এই খিন্ন, শূন্য শুভ্রতায়,
তোমার মানসজাত সন্তানেরা বয়োপ্রাপ্ত একদা এখানে
তোমার মনেরে, জেনো, বাধা নিবে নব ভূমিকায়।

উপর্যুক্ত কর্তব্যের যতো তুমি হবে অনুগত,
ততো লাভ এবং তোমার গ্রন্থ সম্পাদিত হয় সেই মতো।

অনুবাদ
শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য

সনেট ২৭

Weary with toil, I haste me to my bed

দিবাকর্মে শ্রান্ততনু খুঁজি শয্যা উন্মুখ, আতুর ;
পর্যটন-পর্যুদস্ত শরীরীর সে-প্রিয় কুলায়।
সেথা গেলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে আরেক ঘুরঘুর :
মনের খাটুনি সুরু, দেহ যবে নিষ্কর্মা এলায়।
সেখানে আমার চিন্তা অকুস্থল ত্যজিয়া হেলায়,
আকুতির তীর্থযাত্রা কাম্য করে তোমার দ্যুলোকে ;
বেবাক্ উন্মুক্ত রাখে নিদ্রাতুর আঁখিপত্র, চায়
ব্যাপ্ত সে-তিমিরে যার নিত্য স্থিতি অন্ধের দু চোখে।
তবু চিত্ত-সমুত্থিত মায়াময়ী দৃষ্টির উৎসারে
তব ছায়াখানি লভে মোর দৃষ্টিরহিত নয়ান,
সে-ছায়ায় ছিন্ন নিশা পূর্ণ যেন বৈদূর্য-বাহারে ;
লুপ্ত অমা ; পাল্টে যায় তমসার জরতী বয়ান

দিবাভাগে সর্ব অঙ্গে দেহে, আর রাত্রিকালে মনে
তোমারে আমারে নিয়ে কাটে দিন অশান্ত বিজনে।

অনুবাদ
শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য

হৃদয় সম্পর্কিত

শ্রীশুভাশিস্ গোস্বামী

সমস্ত হৃদয় জুড়ে, হৃদয়ের কক্ষ জুড়ে কি যে হানাহানি !
কয়েকশো কীটের উৎপাত। কয়েকশো পতঙ্গ
কেন দড়ি-টানাটানি খেলেছিল ? কেন ?
বুকের কোথাও উজ্জ্বল বিজলী-আলো জ্বলেছিল নাকি ?

দ্বিধাময় উপদ্রুত বেলাগুলি শুধু কেটে যাবে !

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া যদ্যপি বিধান,
তবু অবেলায় হৃদয়ের অবস্থান টের পাওয়া যাবে
মৃত কুরুক্ষেত্র কিংবা প্রমত্ত চড়ক মেলায়।
(জনান্তিকে : গহন অরণ্য নয়, বড় বেশি দূর,
হে দয়াময় ! বিপদে মোরে রক্ষা কর প্রভু !)

স্মৃতির এ্যালবাম জুড়ে
সমস্ত মজাদার ফটোগ্রাফ ছড়াছড়ি ছিল।
সহস্ররজনীধন্য অভিনয় ইত্যাদির ছবি,—
অবশ্য রূপকথার অলৌকিক ডাইনির মতো
শোনিতপানের সেই বীভৎস স্মৃতির ফটোগ্রাফ
সন্ধানে বিফল হ'বে।
কেননা শ্যেনবিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
বদ্ধ পাখা, বহুক্ষণ দূরে চলে গেছ।

এখন অসম্ভব যন্ত্রণায় বুকের ভিতরে
কয়েকশো মহড়ারত যুদ্ধের বিমান ছুটে যায়।
অন্ধকার বারান্দায় রাত্রির প্রহর কেটেছিল,—
যামিনী না যেতে কেন অসময়ে জাগালে ঈশ্বর !

দংশন

শ্রীচয়ন সেনগুপ্ত

তীব্র সুখ যে আত্মহননে ; উন্মাদতরী
ভাসিয়ে দিয়েই, ভাসিয়ে দিয়েই দিগন্তহারা,
নির্ভাবনায় ভেসে যেতে যেতে
চোখের পলকে তলাতে পারা।

প্রতিকূল কিনা অনুকূল বায়ু জানা নেই মোটে
তাই যদি হয় যাকনা যেদিকে নিজের খুশি—
আটকা পড়েছি আমরা এখন ঝড়ের রাতে,
ক্ষমতা কোথায় খাঁচা কিনে এনে ইঁদুর পুষি।

সুকঠিন বড় প্রাচীর ডেঙানো, কাঁটা তার ঘেরা,
অঙ্ক মেলেনা, কি জানি কি হয়, ভাগশেষ থাকে,
থেকে থেকে যেন কিসে কামড়ায় বোঝানো দায়,
একেই রাত্রি, তারপর শুধু ডেকে যায় কাকে।

মাছের কথা

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

প্রাণী-বিজ্ঞানে মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসাবে মাছের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সবচেয়ে নিচুস্তরের প্রাণী হিসাবে গণ্য। পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলে, মিষ্টি এবং লোনা জলে মাছের বাস। মাথা (head) মধ্য শরীর (trunk) এবং লেজ (tail) এই তিন অংশে মাছের দেহ বিভক্ত। আর, বেশির ভাগ মাছের শরীর আঁশে ঢাকা। চুনো পুঁটি থেকে, রুই কাতলা, ভেটকি, ইলিশ প্রভৃতি কতো অসংখ্য জাতের মাছ আছে, তার ইয়ত্তা নেই। মাছ অ্যানোফিলিস মশার লার্ভা বা শূককীট খেয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই ভাবে মাছ মানুষের উপকার করে। তাছাড়া, আজকাল মাছ থেকে নানারকম খেলনা প্রভৃতি তৈরি হয়। মাছের আঁশ থেকে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হয়—যা বাজারে আজকাল বোম্বাই মুক্তা নামে পরিচিত। ইদানীং বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছের চাষ করে, আর্থিক উন্নতি এবং পুষ্টিকর সুষম খাদ্য—দুইই পাওয়া যাচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, মাছ মানুষের কতো প্রয়োজনীয়। আর, এই কথাগুলি মনে রাখলেই বোঝা যাবে, বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত মাছের বর্ণনামূলক প্রবন্ধগুলিরও একটা সার্থকতা আছে।

মাছের বিষয়ে কোন বর্ণনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক আছে—তেমন সেই সঙ্গে আছে রসনা ও রসিকের পরিচয়। মাছ রসনাতৃপ্তিকর, একথা আমিষভোজীমাত্রেই এবং বিশেষত মাছ রসিক বাঙ্গালীমাত্রেরই জানা আছে। আমিষ এবং অন্নভোজীদের কাছে মাছ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অতি উপাদেয় খাদ্য বিশেষ। একমাত্র নিরামিষভোজীরা ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষই খাদ্যহিসাবে মাছের ভক্ত। আর, ভেতো বাঙ্গালীর কাছে আহার্যের তালিকায় মাছের নাম সর্বপ্রথমে—একথা বোধ হয়, শিশু, এবং বালকেও বলতে পারবে। তাছাড়া, শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য (balanced diet) হিসাবেও মাছ রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। একমাত্র

দুধ ব্যতীত বোধ হয়, আর কিছুতেই মাছের মতো বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন পাওয়া যায় না। খাদ্য হিসাবে বেশি পরিমাণে মাছ গ্রহণ—শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়ও বটে। ফলে, গ্রীষ্মপ্রধান (tropical) ভারতে মাছের এত চাহিদা—মাছ এত প্রিয়। আর তাই চুনোপুঁটি থেকে রুই কাতলা পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের নানা আকারের এবং বিচিত্র স্বাদের মাছের সদ্ব্যবহার করে আমিষ-ভোজীরা। মাছ ভোজী বাঙ্গালীর প্রিয় নানাজাতের মাছের কথা এবং সংশ্লিষ্ট নানা জ্ঞাতব্য তথ্য মনোরমভাবে পরিবেশিত হয়েছে—বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত মাছের বর্ণনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে।

দুই

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যগুলিতে ভোজনবিলাসী বাঙ্গালীর রসনাতৃপ্তিকর যে তালিকা পাওয়া যায় তাতেও মাছ সুখাদ্য হিসাবে লোভনীয় ভাবে বর্ণিত। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষদিকে সংকলিত প্রাকৃত পদসংগ্রহ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক গ্রন্থে বাঙ্গালী অবহট্‌ঠ কবির একটি কবিতায় মাছের লোভনীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। কবিতাটি এই রকম :

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভতা পত্তা,
গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা, নালিচা, গচ্ছা,
দিজ্জই কন্তা খাই পুণবন্তা॥

অর্থাৎ : ওগরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৈলি [মৌরালা ?] মাছ, নালিচা [নালতা ?] শাক,—কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান খাচ্ছে।

মাছ-দুধ-ঘি-ভাত-প্রিয় বাঙ্গালীর এমন সুন্দর অন্তরঙ্গ চিত্র এখনও বাঙ্গালীর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। কারণ, এখনও ভাতের সঙ্গে মাছ বাঙ্গালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য।

এ সমস্ত তথ্য বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্র লাল মিত্রের কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। দেখা যায়, বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার পাতায় পাতায় দেশি-বিদেশি নানা জাতের ও বিচিত্র স্বাদের মাছের পরিচয় মূলক সচিত্র বিবরণ।

তিন

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর অতি পরিচিত এবং প্রিয় রুই কাতলা প্রভৃতি দেশী-বিদেশী নানাজাতের এবং বিচিত্র স্বাদের মাছের কথা

সচিত্র ভাবে এবং আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উড়ন্ত মাছ ও কাতলা মাছ নামক প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য।

এখানে, ১ 'উড়ন্ত মাছ' ও ২ 'কাতলা মাছ' নামক দুটি স্বল্পায়তন অথচ কৌতূহলোদ্দীপক রচনা সংকলন করা যাচ্ছে। 'উড়ন্ত মাছ' নামক প্রবন্ধে জানা যায়—আমাদের পরিচিত বাটা মাছের মতো একরকম মাছ তার ডানার সাহায্যে যেমন জলের উপরে উড়তে পারে তেমনই জলের মধ্যে দ্রুতবেগে সাঁতার দিতে পারে। বন্দুকের গুলি যতো উপরে যেতে পারে, এই উড়ন্ত মাছও জল থেকে একেবারে ততো উঁচু পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। জানা যায়, এই মাছ প্রধানত ভূমধ্য সাগরেই দেখা যায়। 'কাতলা মাছ' নামক প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালীর অতি পরিচিত কাতলা মাছ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি বর্ণনা করেছেন অন্তরঙ্গভাবে। বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে এইরকম—

উড্‌ডীয়মান মৎস্য। অনেকের আশু বোধ হইতে পারে যে যে জীবসকল নিয়ত জলে বাস করে ও তীরে উঠিলে তৎক্ষণে পঞ্চত্ব প্রায় হয় তাহারা কদাপি আকাশে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবেক না; কিন্তু ফলতঃ সে ভ্রমমাত্র। বিশ্বস্রষ্টার বর্ণনাতীত কৌশলে অনেক স্তন্যজীবী পশু সমুদ্রে বসতি করিতেছে, কোন কোন বিহঙ্গম পশুর ন্যায় সর্বদা ভূমিতে দিনযাপন করিতেছে, কদাপি আকাশে উঠিতে সক্ষম নহে, ও কোন কোন মৎস্য খেচরের ন্যায় অনায়াসে আকাশমানে বিরাজ করিয়া থাকে। বর্তমান প্রস্তাবে শেষোক্ত মৎস্য বিশেষের বিবরণ বক্তব্য। এই মৎস্যের দেহ বাটা মৎস্যের ন্যায়। তাহার দেহ অস্থূল ও দীর্ঘাকার, তাহার চক্ষু অতি বৃহৎ। তাহার উভয় পার্শ্বের ডানা এমৎ লম্বাচৌড়া যে তদবলম্বনে সে অনায়াসেই উড়িতে সক্ষম হয়। ঐ ডানাতে যে সে কেবল উড়িতেই পারে তাহা নহে; তদ্দ্বারা জলেতেও নিরতিশয় বেগ-সহকারে তাহারা সাঁতার দিতে পারে। বন্দুকের গুলি যতদূর উঠিয়া থাকে ততদূর পর্য্যন্ত এই মৎস্য জল ছাড়িয়া একোদ্যমে উঠিতে সমর্থ হয়, ও তাহাতে শ্রান্ত হইলে একবার জলে পড়িয়া সন্তরণ দিয়া শ্রান্তি দূর করত পুনর্ব্বার অন্তরীক্ষে উড্‌ডীন হয়। ডলফিন্ নামক এক জাতীয় বৃহদাকার সমুদ্র মৎস্য ইহাকে খাইবার জন্য অত্যন্ত দ্রুতবেগে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা কেবল এই পক্ষবলে তাহার করালগ্রাসে না পড়িয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করে। উপরিভাগে উড্‌ডীন হইবার সময়ে কখন কখন বৃহৎ পক্ষিতে তাড়া

দেয়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে সন্তরণ দিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জাতীয়ের মৎস্যের প্রধান বাসস্থান ভূমধ্যস্থ সাগর, পরন্তু গ্রীষ্মকালের অন্যান্য সমুদ্রেও ইহা কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। (৩য় পর্ব ২৫ সংখ্যা, শকাব্দ ১৭৭৫ বৈশাখ।)

কাতলা মৎস্য। (উপরে যে চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহার বিবরণার্থে প্রস্তাব বাহুল্য করা কোনমতে বিবেচনা সিদ্ধ নহে।) কাতলা মৎস্য কে না জানেন? তাহার বৃহৎ মস্তক, সুস্বাদু দেহ, কুঁড়া প্রিয়তা, তড়াগ-নিম্নে নিবাসে দ্বেষ, ইত্যাদি বিষয় আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত আছে। অতএব তদাখ্যানে কালক্ষেপ অবশ্যই অকর্ত্তব্য স্বীকার করিতে হইবে; বিশেষতঃ পাঠদশায় আমরা শুনিয়াছিলাম, —"এক যষ্টির একদিকে চার ও অপরদিকে এক পাগল" এই বলিয়া কোন পণ্ডিত মৎস্যধারির লক্ষণ করিয়াছেন, এবং তদবধি মৎস্যধৃত করণাভিপ্রায়ে ভ্রমেও আমরা তড়াগের নিকটবর্ত্তীও হই নাই, ও রোহিত কাতলার স্বভাব ও ধর্ম্ম বিচারার্থে ভোজন-সময় ব্যতীত কদাপি মনোযোগ না করাতে তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞ আছি; সুতরাং কাতলা ধৃত করণার্থে কুঁড়া ও যোড়কা উত্তম, কি মেথি-ভাজা, কি পচা পনির, কি মদের চোস্তা শ্রেয়ঃ, ও সরু দুধে কেঁচো, কি পিঠালি, কি ঘৃতাক্ত ময়দার চার ঝটিতি উপকারী, তাহা নির্দ্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—"তবে ঐ ছবি মুদ্রিত করিবার আবশ্যক কি?" তাঁহাদিগকে এই পত্রের নাম স্মরণ করাইলেই তদুত্তর হইবে। বিবিধার্থের পাঠকমণ্ডলী মধ্যে চিত্রার্থী অনেকে আছেন, তাঁহাদিগের সন্তোষ করা অস্মৎপক্ষে অনিষ্ট নহে। অপর উপরে মুদ্রিত কাতলার দ্বেষী মহাশয়েরা বিবিধার্থের মূল্য বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন, প্রস্তাবিত চিত্রের নিমিত্ত তাহাদের সিকি পয়সা অধিক ব্যয় হইবেক না; ঐ মূল্যে কি উক্ত চিত্র মহার্ঘ্য হইতেছে? (৩য় পর্ব ২৬ সংখ্যা, শকাব্দ ১৭৭৬ বৈশাখ, পৃ ৪৪।)

উদ্ধৃত প্রবন্ধ দুইটিতে এবং অন্যত্র উল্লিখিত ছবিগুলি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এইজন্যে ছবির উল্লেখপূর্ণ লাইনগুলি ( ) বন্ধনী মধ্যে রাখা হয়েছে।

চার

মাছের বিবরণমলক যতগুলি প্রবন্ধ আলোচ্য বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার একটি কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। (প্রত্যেক প্রবন্ধের নামের পাশে পত্রিকায় প্রকাশের সন-তারিখ জ্ঞাপক সংখ্যা চিহ্ন দেওয়া

হয়েছে। যেমন: কাত্‌লা মৎস্য, ৩।২৬; অর্থাৎ, বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার ৩য় পর্ব ২৬ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল)

১. রোচ্‌ এবং ডেস মৎস্য (সচিত্র), ১।৭; শকাব্দ ১৭৭৪ বৈশাখ, পৃ. ৯৭-৯৮।

২. উড্‌ডীয়মান মৎস্য, ৩।২৫; চৈত্র ১৭৭৫, পৃ. ২৩।

৩. কাত্‌লা মৎস্য (সচিত্র), ৩।২৬; বৈশাখ ১৭৭৬, পৃ. ৪৪।

৪. কার্প বা বিলাতি রোহিত মৎস্য (সচিত্র), ৩।৩১; আশ্বিন ১৭৭৬, পৃ. ১৫২-৫৩।

৫. কম্পজনক বাইন মৎস্য (সচিত্র), ৩।৩৩; অগ্রহায়ণ ১৭৭৬, পৃ. ২১৪-১৬।

৬. ট্রৌট মৎস্য (সচিত্র), ৩।৩৪; পৌষ ১৭৭৬, পৃ. ২৩১-৩২।

(তালিকায় উল্লিখিত ২ এবং ৩ সংখ্যক প্রবন্ধ দুটি পূর্ব অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে সংকলিত হয়েছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দ্রষ্টব্য।)

পাঁচ

পূর্বোক্ত তালিকার প্রথম—'রোচ্‌ এবং ডেস মৎস্য' নামক প্রবন্ধটির এক কৌতূহলোদ্দীপক উল্লেখ পাওয়া যায় অন্যত্র। 'দুরাকাংক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭ খৃ.) রচয়িতা এবং প্রেসিডেন্‌সি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২ খৃ.) তাঁর স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়) উক্ত 'রোচ্‌ এবং ডেস মৎস্য' নামক প্রবন্ধটিকে অমর করে গেছেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম পর্যায়, ১৩২০ সাল) থেকে জানা যায়—একবার কৃষ্ণকমল তাঁর প্রণীত 'বিচিত্রবীর্য্য' (১৮৬২ খৃ:) কাব্য গ্রন্থখানির মুদ্রিত এক খণ্ড পড়তে দেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। প্রায় মাস তিনেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ওই বইখানি কৃষ্ণকমলকে ফেরত দেন, সময়াভাবে পড়তে পারেন নি, এই অজুহাতে। এই ব্যাপারে কবিযশোপ্রার্থী হিসাবে কৃষ্ণকমলের মনে উষ্মার ভাব জাগে। কৃষ্ণকমল বলছেন:

"আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byron-এর English Bards and Scotch Reviewers-এর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে। যোলো সতের বৎসর বয়সে 'দুরাকাংক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম।"—পৃ ৩৮, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম পর্যায়

উল্লিখিত কবিতাটির অন্তর্গত রাজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গ কৃষ্ণকমলের রচনা অনুযায়ী (ঐ, পৃ ৩৮) এই রকম—

"তাদৃশ ক্ষমতাবল যদিও না ধরি,
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি।
কখনও মাছের মত মারহ ঠোক্কর,
দু' একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ॥"

এই কবিতাংশটির পাদটিকায় বলা হয়েছে (ঐ, পৃ ৩৮)

"বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক পত্রিকাতে তিনি [রাজেন্দ্র লাল মিত্র] একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার নাম Roach ও Dace, বিলাতের দুই প্রকার মাছ।"

অনুসন্ধানে জেনেছি, উল্লিখিত প্রবন্ধটি বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার ১ম পর্ব ৭ম সংখ্যায় (শকাব্দ ১৭৭৪ বৈশাখ, পৃ ৯৭-৯৮) প্রকাশিত হয়। মাছের বিবরণমূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি তালিকা পূর্ব অধ্যায়েই সংকলন করা হয়েছে। ওই তালিকার প্রথম 'রোচ্ এবং ডেস মৎস্য' নামক প্রবন্ধটির কথাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন—এ কথা এখন প্রমাণিত হলো। উপভোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে প্রবন্ধটি পরবর্তী (৭ম) অধ্যায়ে যথাস্থানে সংকলন করা হয়েছে।

ছয়

পূর্বোক্ত তালিকার (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ৪ ও ৬ সংখ্যক, অর্থাৎ—'কার্প বা বিলাতি রোহিত মৎস্য' এবং 'ট্রৌট মৎস্য'—নামক প্রবন্ধ দুটির সার সংক্ষেপ সংগ্রহ করা গেল।—

কার্প বা বিলাতি রোহিত মৎস্য (৪)। ইংল্যাণ্ডে রুই মাছের নাম—'কার্প'। কার্প মাছ প্রকৃত পক্ষে ইংল্যাণ্ডের নয়। প্রায় চারশো বছর আগে ফরাসী দেশ থেকে এই কার্প মাছ আনা হয়, এবং তখন থেকেই কার্প মাছ ইংলণ্ডের সর্বত্র বংশবৃদ্ধি করেছে। একটি কার্প মাছ প্রায় ৭ লক্ষ ডিম পাড়ে, ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এর বংশ আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই কার্প মাছ নিয়মিত ভাবে খাওয়া পেলে সহজেই মানুষের পোষ মানে। এই মাছ ৫।৭ সের থেকে প্রায় আধ

মণ পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে।

ট্রৌট মৎস্য (৬)। ইংলণ্ডের কার্পজাতীয় রুই মাছের মতো আর এক জাতের মাছের নাম 'ট্রৌট' মাছ। এই মাছ ৮।১০ সের থেকে ৩০।৪০ সের পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। এই ট্রৌট মাছও নিয়মিত খাবার পেলে মানুষের পোষ মানে। এই মাছ ২৮ বছর পর্যন্ত বাঁচে, এমন কথাও জানা গেছে। ট্রৌট মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু, এবং বিলেতে এই মাছের মতো সুস্বাদু মাছ আর নেই। এদেশে রুই মাছ ধরার যেমন আগ্রহ দেখা যায়, বিলেতে ট্রৌট মাছ ধরতেও তেমনই প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

সাত

বর্তমান প্রবন্ধের স্বার্থে, বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন জাতের মাছের বিবরণমূলক কয়েকটি রচনা সংকলন করা গেল। রচনাগুলি পূর্বোক্ত তালিকায় উল্লিখিত—১, ও ৫ সংখ্যক প্রবন্ধ। রচনাগুলির নামের তালিকা এইরকম:

রোচ্ এবং ডেস মৎস্য।১
কম্পজনক বাইন মৎস্য।৫

তালিকায় উক্ত 'রোচ্ এবং ডেস মৎস্য' নামক প্রবন্ধে জানা যায়: বাংলাদেশে সুপরিচিত এবং প্রিয় রুই কাতলা মাছের মতো রোচ এবং ডেস নামক দুই জাতের মাছ ইংল্যাণ্ডে বিশেষ ভাবে পরিচিত। শেষোক্ত 'কম্পজনক বাইন মৎস্য' নামক প্রবন্ধে জানা যায় দক্ষিণ অ্যামেরিকার নদীতে বাইন নামে এক জাতের মাছ পাওয়া যায়। বাইন মাছ আমাদের পরিচিত। কিন্তু দক্ষিণ অ্যামেরিকার এই বাইন মাছের শরীরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন ওই বাইন মাছকে স্পর্শ করলে সুস্থ সবল মানুষ এবং তেজী ঘোড়া পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়।

রচনা সংকলন

১. রোচ্ এবং ডেস মৎস্য। (সচিত্র)•

(১ম পর্ব, ৭ম সংখ্যা, শকাব্দ ১৭৭৪ বৈশাখ)

কোন উদরপরায়ণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

কেচিদ্বদন্ত্যমৃতমস্তি সুরেশলোকে,
কেচিদ্বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু।
ক্রমোবয়ং সকল শাস্ত্রবিচারদক্ষাঃ
জম্বীরনীর পরিপূরিত মৎস্যখণ্ডে ॥

অর্থাৎ "কেহ কেহ কহেন যে অমৃত ইন্দ্রদেবের ভবনে অবস্থান করে; কেহকেহ বা কামিনীদিগের অধরপল্লবে তাহার স্থিতি-নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা শাস্ত্রসমূহের নির্যাস জ্ঞাত হইয়া কহিতেছি যে পাতিনেবুর রসে জরা মৎস্যেতেই অমৃত প্রাপ্য।" যদিচ ইহা কেবল কবির বাক্য, তত্রাপি এতদ্দেশীয় মহাশয়দের অনেকে ইহা প্রায় সত্য জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের মতে খাদ্য বস্তুর মধ্যে বড় রোহিত মৎস্যের মস্তক যে রূপ উৎকৃষ্ট তাদৃশ আর কিছুই নাই। ফলতঃ এতাদৃশ মুগ্ধ হইবার উপযুক্ত এতদ্দেশে তপস্যাদি নানাবিধ উত্তম ২ সুস্বাদু মৎস্যও প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্বিষয়ে কোন মৎস্যপ্রিয় ইংরাজ কহিয়াছেন—"বিলাত হইতে এতদ্দেশে আগমন করাতে আমার বিবিধ শারীরিক ক্লেশ হইয়াছে; আমি দুর্ব্বল হইয়াছি; যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইয়াছি; অল্প কালে বৃদ্ধ হইয়াছি, বটে, কিন্তু তপস্যা মৎস্য ভক্ষণরূপ সুখভোগও করিয়াছি, তাহাতেই সকল ক্লেশ দূরীকৃত হইয়াছে।" পরন্তু বঙ্গদেশে যে সকল মৎস্য ব্যবহার আছে তাহার বিবরণেরও বিশেষরূপে প্রচার আছে; অতএব সম্প্রতি তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল 'রোচ্' ও 'ডেস' নামক বিলাতি প্রসিদ্ধ মৎস্যদ্বয়ের বিববরণ লেখিতব্য হইল।

(প্রস্তাবিত মৎস্যদ্বয়ের অবয়ব পূর্ব্বপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।) তদ্দৃষ্টে বোধ হইবেক যে ইহাদের অবয়বানুসারে ইহারা রোহিত মৎস্যের গণমধ্যে নির্ণেতব্য। রোচ্ মৎস্য বিলাতে অত্যন্ত সুলভ; এবং ইহার সহস্র সহস্র মন [মণ] প্রতি বৎসর মনুষ্য ব্যবহারার্থে ধৃত হয়। ইহার পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল সবুজ, এবং তদুপরি নীলবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। ঐ বর্ণ উভয় পার্শ্বে ম্লান হইয়া বক্ষদেশে লুপ্ত হওত উজ্জ্বল রজতাভে ব্যক্ত হয়। নয়ন পুত্তলীর বর্ণ পীত; কর্ণকুপির আবর্ত্তনী রজতবৎ; পৃষ্ঠডানা (পৃষ্ঠদেশের উর্দ্ধভাগস্থিত ডানার নাম পৃষ্ঠডানা। বক্ষদেশের উভয়পার্শ্বেস্থিত ডানার নাম বাহুডানা, তৎপশ্চাতেস্থিত ডানার নাম বক্ষডানা, তৎপশ্চাৎ উদরডানা, এবং তৎপশ্চাৎ গুহ্যডানা।) ও পুচ্ছের বর্ণ মলিন কটা; বক্ষডানার বর্ণ কমলালেবুর ন্যায়; ও উদরডানা ও গুহ্যডানার বর্ণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। রোচ্ মৎস্যের পরিমাণ এক সের; এবং কদাপি ২-২॥ সেরও হয়। রোহিতগণের অন্য অন্য মৎস্যের ন্যায় রোচ্ মৎস্যেরা স্থির-জলপ্রিয়; এবং তড়াগ বা মন্দগামিনী নদীতে নিয়ত বাস করে; ও দিবসে গভীর জলে থাকিয়া রজনীযোগে অল্প জলে খাদ্যাহরণ করে। শীতকালেও ইহারা গভীর জলে অবস্থানপূর্ব্বক বর্ষাঋতুর প্রাদুর্ভাবসময়ে অনতিগভীর স্রোতোজলে আগমন করিয়া অণ্ড প্রসব করে। ইহার অবয়ব স্বর্ণ-পুঁঠি মৎস্যের তুল্য, এবং বাটা মৎস্যের ন্যায় ইহা কণ্টকপূর্ণ, সুতরাং সুখাদ্য

নহে; কিন্তু ইহাতে অতি সুস্বাদু ঝোল প্রস্তুত হয়, এবং তদর্থেই ইহাদিগকে সংগ্রহ করা যায়। রোচ মৎস্য স্বভাবতঃ মিষ্টজলপ্রিয়; কদাপি লবণ সমুদ্র জলে গমন করে না। ইহাদের বুদ্ধি বুদ্ধি অত্যন্ত দুর্ব্বল; এবং তৎপ্রযুক্ত ইংরাজি ধীবরেরা ইহাদিগকে 'জল-ভেড়া' নাম বিখ্যাত করিয়াছে।

ডেস মৎস্য রোচের তুল্য, কেবল ইহার শরীর রোচ হইতে লঘু ও কৃশ, এবং কতক মৃগাল মৎস্যের ন্যায়। বাটা খড়কিয়া বাটার যেরূপ ভেদ ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ; ফলতঃ ইহারা উভয়ে বাটা মৎস্যের বংশজাত। ইহার ডানার বর্ণ রোচ্ মৎস্যের ডানার বর্ণের মত ঘোর হয় না। অপর রোচ্ মৎস্য পুষ্করিণীতে উত্তমরূপে জন্মে, কিন্তু ডেস্ স্রোতোজল না হইলে থাকিতে পারে না। এই মৎস্য জাতিদ্বয়ের অণ্ড প্রসব করিবার সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, এবং মৃদুগামি স্রোতোজলে ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

২. কম্পজনক বাইন মৎস্য। (সচিত্র)

(৩ পর্ব ৩৩ সংখ্যা, শকাব্দ ১৭৭৬ অগ্রহায়ণ)

পদার্থবিদ্যা-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা নানা উপায় দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন, যে পদার্থ আকাশে বিদ্যুৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা সজীব নির্জীব সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান আছে, এবং অনেকে মনে করেন, যে তাহা হইতেই সজীব বস্তুর গতি শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে তাড়িত বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের বর্ণন-সময়ে (১৩৫ পৃষ্ঠে) ঐ তাড়িত পদার্থের কি কি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে পুনর্দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে, যে তাড়িত পদার্থ অত্যন্ত দ্রুতগামী; জল, বাষ্পপূর্ণ বায়ু ও ধাতুদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে এক নিমেষ মাত্রে সহস্র সহস্র ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিতে পারে; পরন্তু শুষ্ক বায়ু, গালা ধুনা, কাচ, রেশম, কেশ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর দিয়া তাহা কিঞ্চিৎ মাত্র চলিতে পারে না; সুতরাং ঐ দ্রব্যে আবৃত করিয়া রাখিলে তাড়িত পদার্থকে আয়ত্ব করা যাইতে পারে। বিদ্বান ব্যক্তিরা তাড়িতের এই ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়া কোন্ কোন্ পদার্থে তাহা বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদায় নিরূপিত করিয়াছেন। মনুষ্য দেহে এই বিদ্যুৎ-পদার্থ সর্ব্বদা উৎপন্ন হইয়া থাকে; প্রশ্বাস-বাষ্পপূর্ণ বায়ুর সহিত তাহা নির্গত হয় বলিয়া তাহা ধৃত করা যায় না। পরন্তু শীতপ্রধান দেশে বায়ু অত্যন্ত পরিশুষ্ক হইলে মনুষ্য দেহজাত বিদ্যুৎকে ধৃত করা কঠিন নহে। তৎসময়ে অনেকের দেহ হইতে বিদ্যুদগ্নি নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। সুইদন্ [সুইডেন] ও নরওয়ে প্রদেশে শীতকালে চুল আঁচড়াইবার সময়ে অনেক স্ত্রীলোকের কেশ হইতে বিদ্যুৎবৎ অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় ও অন্যত্রে শীতকালে বিড়ালের দেহে হাত বুলাইলে ঐ প্রকার বিদ্যুদগ্নি নির্গত [নির্গত] হইতে দেখা গিয়াছে। অপরাপর জীব দেহেও নানা প্রকারে বিদ্যুৎ শক্তি দেখা যাইতে পারে। পরন্তু এতৎ সম্বন্ধে ইউরোপ-দেশজ এক প্রকার শংকর মৎস্য এবং মার্কিন-দেশজ এক প্রকার বাইন মৎস্য অতীব আশ্চর্য্যজনক। (শেষোক্ত মৎস্যের প্রতিমূর্তি পূর্ব্ব পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়াছে ; তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে যে) তাহার অবয়ব এতদ্দেশীয় বাইন মৎস্য হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। দক্ষিণ অমরিকার [অ্যামেরিকার] নদীতে ঐ বাইন মৎস্য অনেক আছে, এবং তথায় তাহারা অপরাপর বাইন মৎস্যের ন্যায় পঙ্ক মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং ক্ষুদ্র মৎস্য কীটাদি ভক্ষণ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ফলতঃ অন্য বাইন মৎস্য হইতে ইহার স্বভাব কোন মতে পৃথক নহে ; পরন্তু ইহাতে এক অত্যদ্ভুত শক্তি আছে, তৎপ্রযুক্ত যে কোন জীব ঐ মৎস্যকে স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহের সমস্ত গৃন্থিতে [গ্রন্থিতে] খিল ধরিয়া যায় ; তথা সে স্পন্দ রহিত হইয়া নিপতিত হয়। ঐ খিলধরা এতাদৃশ ভয়ানক যে মনুষ্য এক কালে দুই তিনটা মৎস্যকে স্পর্শ করিলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাকে স্পর্শ করিলে অশ্বও নিপতিত হইয়া থাকে, সুতরাং অন্য ক্ষুদ্র পশু যে তৎস্পর্শে ম্রিয়মাণ হইবে আশ্চর্য্য নহে। বিলাতে এক প্রকার শংকর মৎস্য আছে, তাহাতেও এই অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ঐ শক্তি তাদৃশ প্রখর নহে। ঐ শংকর মৎস্য স্পর্শ করিলে হস্তে খিল ধরিয়া থাকে ; কিন্তু তদ্ধেতুক পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এই শক্তিতে প্রস্তাবিত মৎস্যদিগের কি বিশেষ উপকার হয়, তাহা নিরূপিত করা দুষ্কর ; বোধ হয়, তাহাদিগের শত্রুদমন ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত জগৎপাতা তাহাদিগকে ঐ শক্তিবিশিষ্ট করিয়াছেন ; পরন্তু ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, যে বিদ্যুৎ পদার্থ সর্ব দেহে বর্ত্তমান আছে, তাহারই আধিক্যে এই শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সা হি ত্যে পু র স্কা র

শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী

সাহিত্যে পুরস্কার ইদানীং একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনকালেও এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিত। অবশ্য বর্তমানকালে এ নিয়ে কেচ্ছাই বেশি হচ্ছে। মতভেদ আর কেচ্ছার ভিতর পার্থক্য বিরাট থাকাতেই এই আলোচনা। সেকালে দেখতে পাই রাজা-রাজড়ার সভাতে কবি-সাহিত্যিক সম্মিলিত হোতো। দেশ-বিদেশ থেকে এসে সাহিত্য শিল্প ব্যাকরণ অর্থাৎ এক কথায় পাণ্ডিত্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতো এবং জনসাধারণকর্তৃক প্রতিপন্ন শ্রেষ্ঠদের রাজা-বাদশাজাদারা পুরস্কৃত করতেন। কখনো খেতাব দিয়ে কখনো অর্থ দিয়ে। আবার কখনো দুটোই জুটতো সাহিত্যিকের কপালে। তখনো যেমন সাহিত্য বিচারের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল না—আজও তেমনি নেই। ধাতুর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় মূল্য দিয়ে—অর্থকরী মূল্য দিয়ে। কবি বা এককথায় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবার তেমন কোনো সহজ পন্থা নেই। প্রতিভার মূল্যায়ণ তা হলে নিশ্চয়ই হবে পাঠকমহলের স্বীকৃতি দিয়ে ? এই স্বীকৃতিও আবার বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ভাবে দেখা দেয়। তাছাড়া পাঠকমহলের স্বীকৃতিরই বা মাপকাঠি কী। বই-বিক্রিকে যদি স্বীকৃতির ব্যারোমিটর ধরি তাহলেই কি সত্যিকারের সাহিত্যের বা প্রতিভার যথার্থ বিচার হবে ?

আপনারা সকলেই একমত হবেন যে শুধু বই বিক্রি দেখলেই চলবে না। কেননা, সর্বকালে সর্বদেশেই দেখা যাচ্ছে (ইস্তক আজ পর্যন্ত*) উত্তেজক বইই বেশী কাটে। এবং এই সব উত্তেজক গ্রন্থকর্তাদের সকলেরই উচ্চাশা যে, কোনো-মহৎ লোকের মতো নয়—বড়ো জোর তাঁদের প্রার্থনা, কোলকাতায় একখানা বাড়ি-গাড়ি আর সহস্র অর্ধশিক্ষিত পাঠকদের করতালিধ্বনি লাভ। তা এঁরা পেয়েও থাকেন। কিন্তু আসল যে শ্রদ্ধা যে মূল্য সৎসাহিত্যিকরা পেয়ে থাকেন তা এঁরা কদাপি পেতে পারেন না। পানও না। এঁদের অনেকেরই সাহিত্যকর্ম কাগজীসুলভ। আজ হৈচৈ কাল নিস্তব্ধ। হঠাৎ-অভিজ্ঞতার চকমকি চোখ ধাঁধালেও গভীরতা

না থাকায় অর্থাৎ জীবনদর্শনে ফাঁকি থাকায় কালের কষ্টিপাথরে তার দাগ মুছে যেতে বাধ্য। কিন্তু এ কথা কখনোই বলব না যে, পুরস্কৃত সাহিত্যিকমাত্রই কালোত্তীর্ণ নন। পুরস্কৃত সাহিত্যিক এমন অনেকেই আছেন যাঁরা পুরস্কার পাবার আগে ও পরে সমানভাবেই শ্রদ্ধেয় এবং পঠিত। এবং এর উল্টোটাও সমানভাবে বর্তমান। অর্থাৎ এমন অনেক সাহিত্যিক পুরস্কৃত হচ্ছেন যাঁরা পুরস্কার লাভ করবার আগে ও পরে সমানভাবেই অপাঙ্‌ক্তেয়।

যে কথা বলতে চাইছি বর্তমানে পুরস্কারের আসল রূপ কী। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে এখন পুরস্কারের ভিতর গোপনে রাজনীতি খেলা করছে। অর্থাৎ কে বামপন্থী কে দক্ষিণ এ চিন্তা এখন পুরস্কার-সমিতির কাছে সাহিত্যের মূল্যায়ণের চাইতেও বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই রাতারাতি পুরস্কার-খেতাব ইত্যাদি নানাধরণের খেতাব বিলিয়ে অনেক প্রগতিশীল লেখকদের সরকার বা কোনো গোষ্ঠী হাত করতে চাইছেন। অনেক নাট্যগোষ্ঠীকে এইভাবে পুরস্কৃত করে খেতাব বিলিয়ে জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে আনা হয়েছে, অনেক শিল্পীকেও মূক করে দিয়েছে। শোনা যায় কোনো এক বিখ্যাত যন্ত্রশিল্পী সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর অনুষ্ঠান আজকাল আর বেতারে শোনা যাচ্ছে না। ঘটনাটা আমার শোনা কথা, কতদূর সত্য জানি না। তবে এটা ঠিক যে, অনেক-দিন অমন খ্যাত-শিল্পী ন্যাশনাল প্রোগ্রাম পাচ্ছেন না! গণনাট্যসংঘেরও অনেক প্রতিভাকে এইভাবে বিনষ্ট হতে দেখছি। তাহলে কী আমরা এ কথা বলব না, সরকারি পুরস্কার শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তাধারাকে গ্রাস করছে? এই সমস্যা আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা। পাস্তেরনাক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। পাঠকরাই জানেন, এর পিছনে কতটুকু সাহিত্য আর কতখানি ইজ্‌ম্ কাজ করেছে। এই তো সেদিন সার্ত্রের ঘোষণায় আমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। The evolution of a writer প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন [The Statesman, May 2, 1965]—

.....The reasons given by Sartre for his refusal of the Nobel Prize are consistant with the image of the man, though these too have not escaped criticism. Newspaper readers are familiar with his statement, "If I sign myself Jean-Paul Sartre, it is not the same thing as Jean-Paul Sartre, Nobel Prize winner." What he meant is that a writer taking political,

social or literary stands must not take advantage of extra-literary means. "All the distinctions a writer receives lay his readers open to pressures that I do not judge desirable." But is it not true that his refusal of the prize only added to the glory of winning it? Are not his books selling more?

এই প্রসঙ্গে বলছি, বার্ণার্ড শ-ও নোবেল প্রাইজ ফেরৎ দিয়েছিলেন এবং এতে তাঁর খ্যাতি বেড়েছিল বই কমে নি। শিশিরকুমার ভাদুড়িও ভারতের সরকারি খেতাব প্রহসন বিবেচনায় ফেরৎ দিয়েছিলেন এবং এইসব নানাকারণে ভদ্রলোককে শেষ জীবনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল—এ আমাদের সকলেরই জানা।

Sartre thinks that for the sake of the ideal of peaceful Co-existence between the Eastern and Western cultures, he could not accept honours from either side. But acceptance from both sides might help the very ideal. He adds however, "In the current situation the Nobel award shows itself objectively to be an honour reserved for Western literary men and Soviet rebels." Moreover, the prize was not given him during the Algerian war because of his anti-Government views. He admits he could have given the money (S 53.000) to one of his cherished causes, but was unable to renounce principles shared by all his comrades. It was, in the end, a question of integrity. In the context of Sartre's well-known views on the false values of bourgeois society and the association of the Nobel honour with it (he considered Camus as having sold out to "respectability") and his recent denial of any intrinsic value of literature, it is absurd to imagine him in frock-coat accepting a medal from the King of Sweden. And he is not interested in the money, nor does he need it.

বর্তমানে তা হলে আমাদের চোখের সামনে পুরস্কারদানকর্তাদের স্বরূপ ভালো-ভাবেই খুলে যাচ্ছে এবং যাঁরা এই পুরস্কার গ্রহণ করে গদগদ হচ্ছেন তাঁদেরও।

রাজনীতি-কারণ ছাড়াও সৎসাহিত্যিকদের পুরস্কার গ্রহণে অন্য অনেক বাধা আছে। প্রধান বাধা হোলো পুরস্কার পেলে সস্তা-হাততালি এত প্রকট হয় যে দুর্বল-স্নায়ুর লেখকরা তখন মানুষের কথা ভুলে গিয়ে শুধু পাঠকদের মুখ-চেয়ে লিখতে বসেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অর্ধশিক্ষিত পাঠকদের চাহিদার ভাঁড়ার-ঘরে রূপান্তরিত হন। নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে দুঃখ করে লিখলেন [১৮ নভেম্বর ১৯১৩ শান্তিনিকেতন]—

"The perfect whirlwind of public excitement it has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin can at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never had any friendly feelings towards me nor ever read a line of my works are loudest in their protestations of joy."

পুরস্কার গ্রহণে সব চাইতে বেশি ঘূর্ণিজালে পড়তে হয় স্বয়ং লেখককে।

সেদিন রবীন্দ্রপুরস্কার নিয়ে কী কোন্দল ঘটলো সে তো সবাই দেখেছি। অবশ্য এই কোন্দলের মূলে ছিল দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ্ নিয়ে ঝগড়া। এত গোলমাল হোতো না যদি পুরস্কার দেবার আগে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা যায়। সরকারের কাছে আমাদের কতকগুলি অনুরোধ আছে—

১. উপন্যাস বিচারের মাপকাঠি কী। সাহিত্যবিচার 'বোধের' না 'বাধ্যতার' —এ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সকৌতুক প্রশ্ন আছে।

২. পুরস্কার বিতরণের পিছনে কোনো দল বা রাজনীতি কাজ না করাই বাঞ্ছনীয়।

৩. সরকারের সিঁড়িভাঙা নিয়মকানুনের জটিলতা হ্রাস করা উচিত।

৪. আজকাল দলবাজ সাহিত্যিকদের ঠাণ্ডা লড়াই প্রকটভাবে বিদ্যমান—পুরস্কার বিতরণে এমন কোনো হীনমণ্যতা কাজ না করাই উচিত।

৫. আজকাল তথাকথিত সাহিত্যিকদের অনেকেই চতুর ব্যবসাদার। দাঁড়িপাল্লায় না মেপে তাঁরা পণ্য নিয়মিত রিম রিম মাপছেন! সরকার এদিকেও নজর দেবেন।

যথার্থ গুণীকে পুরস্কৃত করতে হলে সরকারকে এদিকে নজর দিতে হবে।

যদিও পুরস্কারের বা খেতাবের উপর কোনোদিনই শিল্পীদের পস্টারিটি নির্ভর করে না। বরঞ্চ এ ধরণের ঘূর্ণিস্রোতে দু-একবার পড়লে শিল্পীকে পাঁকের দিকেই টেনে নামাবে। তথাপি সাময়িক স্বীকৃতির একটা স্নায়বিক মূল্য আছে—নিস্তেজতা দূর করে। অবশ্য দুর্বলচিত্ত লেখকদের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য।

আমাদের বক্তব্য শেষে হয়ে এসেছে। শেষটা 'সুভাষেণ' সমাপয়েৎ করছি।

সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল্ এ কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা [পুরস্কার পাবার পর] হয়ে গেল। সকল বক্তা এবং শ্রোতা শ্রদ্ধাভক্তিপ্রণতি-স্নেহ এবং আশীর্বাদ দান করলেন কবিকে। সত্যি কথা বলতে কী দুঃখ পেলাম এই ঘটনায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি এবং আমাদের সকলের প্রিয় কবি। তাঁর কবিখ্যাতি পুরস্কার পাবার দীর্ঘকাল আগে থেকেই বাংলাদেশের তরুণ মনে উজ্জ্বল। এককালে তিনি নিজেকে বামপন্থী কবি ভেবে গর্ববোধ করতেন। তাঁকে আমরা দীর্ঘকাল আগেই সংবর্ধনা করেছি—তাঁর কবিতার চরণ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে করে। পুরস্কার পাবার পর হঠাৎ তাঁকে আবার ঘটা করে সংবর্ধনা করার মানে? তা হলে কী এই সংবর্ধনা কবি সুভাষকে না করে পুরস্কারপ্রাপ্ত সুভাষকে করা হোলো? যে কবি এতকাল কৃষক মজুরের শরণ নিতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর 'যত দূরেই যাই' মাত্র দিল্লিনগরী, এ কথা ভাবতে ব্যথা লাগে। কেন না, এখনো কানে ধ্বনিত হচ্ছে—

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া॥

কিংবা—

দিন তো এসে গেছে ভাই রে
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।

আজ শুধু একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে—

বাঁ-দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায় হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল
অথচ

আর একটু নিচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ
তার হৃদয়
লোকটা জানলই না।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কবির কাছে আমাদের করুণ আবেদন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে যে আলাদীনের প্রদীপ একদিন দেখেছিলাম সেটা যেন এত চট করেই ফ্লোরেসেন্ট লাইটে রূপান্তরিত না হয়—এমন-কি, সরকার পাঁচ-হাজার ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই করলেও!

** সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী পুরস্কার বিতরণ বিধির পিছনে একটি গুরুতর সামঞ্জস্যহীনতা রয়েছে সেটা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই সরকারী পুরস্কার ঘোষণার পর অনেকে বিস্মিত হন, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হন, আবার অনেকে মজা পান। এই বিস্ময় বা ক্রোধ অজ্ঞতার অপরিহার্য অভিব্যক্তি। পুরস্কার বিতরণের ব্যাপারে সরকারের দ্বৈধ সত্তার মধ্যে টানাটানি চলে। সাধারণত: সরকারী বা আধা সরকারী পুরস্কার বিতরণের ব্যাপার কোনো 'বিশেষজ্ঞ' কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকে। সে কমিটি গঠন করে দেন সরকার, যে-সরকার এই সব ব্যাপারে একটা মতলব নিয়ে চলেন। কমিটি তৈরির সময় দৃষ্টি রাখা হয় যাতে দলের লোকের অনুকূলে কমিটিতে সদস্য থাকে। তবে সবটুকু তা করা যায় না। বিশেষজ্ঞ রাখতে গেলে দু চারজন নিরপেক্ষ লোকও ঢুকে পড়েন। নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সরকার গ্রহণ করেন আপন ঔদার্যবশত: নয়, বাধ্য হয়ে এবং মতলব নিয়ে, যাতে সরকারী দাক্ষিণ্যে এই সব নিরপেক্ষজন ধীরে ধীরে সরকারী গোষ্ঠীভুক্ত হন এই লোভ দেখিয়ে। বাইরে যদিও নিরপেক্ষ জন গ্রহণের ঘটনাটিকে সরকার মতলবহীনতা ও ঔদার্যের যুক্তি হিসেবে প্রচার করতে ভোলেন না, অর্থাৎ এদিক দিয়েও সরকার লাভবান হতে চেষ্টা করেন। এই হল কমিটি গঠন। তারপর বিচার। সেখানেও টানাটানি চলে। সরকারের হিসেব অনুযায়ী তার অনুকূলেই বিচার হয়ে থাকে অধিকাংশ সময়ে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাইরে সরবে প্রচারিত নিরপেক্ষতার যুক্তিটা হঠাৎ প্রভাব বিস্তার করে ফেলে—তার ফলে দেখা যায় যে সরকারের অনুকূল গোষ্ঠীর বাইরে পুরস্কার চলে গিয়েছে—কখনো সখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা উৎপল দত্তের নামে পুরস্কার ঘোষিত হয়। এতে সরকারের

খুব ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। দুদিকেই সরকার লাভের হিসেব নিয়ে বসে আছেন। এর ফলে দু একজন শিল্পী সাহিত্যিক যদি সরকারের আনুকূল্য লাভের জন্য তাঁদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেন তো সরকার লাভবানই হবেন, আর যদি না দেন তাহলেও ক্ষতি নেই। সরকার সগর্জনে প্রচার করে বেড়ান যে তাদের পুরস্কার বিতরণ-পদ্ধতি অত্যন্ত নিরপেক্ষ; তা নইলে এঁরা পুরস্কার পাবেন কেন, অর্থাৎ দুই একবারের ব্যতিক্রম দিয়ে অধিকাংশ বারের অন্যায় ও মতলববাজীকে ন্যায় বলে প্রমাণ করা হয়। সুতরাং দুই একবারের ব্যতিক্রম দিয়ে সরকারী পুরস্কারের উদ্দেশ্য বিচার করা সংগত নয়। সাধারণভাবে তাঁরা দলের স্বার্থেই এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন এ সত্যটা মেনে নেওয়া দরকার। তবে যেবার স্বার্থ দেখতে গিয়ে একটু স্থূল পথে যাওয়া হয় সেবারেই বাইরে বাদ প্রতিবাদ ও বিস্ময় জাগে—যেমন গত বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে জেগেছে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ঘটনা নূতন নয়—সরকারী পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরেই এ পদ্ধতি চলে আসছে, এবার ব্যাপারটা অত্যন্ত স্থূলভাবে করার ফলে অতি গোবেচারা দর্শকের কাছেও বিসদৃশ লেগেছে, আর কোনো কোনো মহলে ধরা পড়ে গিয়েও সেটাকে খেউড়ের পর্যায়ে নিয়ে যেয়ে শস্তায় বাজীমাৎ করার চেষ্টা চলেছে, যেমন সার্কাসে কোনো কৌশল দেখাতে গিয়ে ক্লাউন অকৃতকার্য হ'লেও সেই প'ড়ে যাওয়াটাকে নানা অঙ্গভঙ্গী দিয়ে শস্তা হাসি সৃষ্টির চেষ্টা করে।

সংকলন

ভিয়েৎনাম

শ্রীবরুণ রায়

…এতদিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার ভূমিকা ছিল উপদেষ্টামূলক। ভূমিকা সম্পূর্ণ বদলে তাঁরা মার্কিন সৈন্যদের সরাসরি যুদ্ধে নামতে নির্দেশ দিলেন। ভাবলেন, এবার হয়ত শত্রুপক্ষ সত্যিই ভয় পাবে।

কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না।

আমেরিকা তখন ভিয়েৎনামের লড়াইয়ে এতদূর জড়িয়ে পড়েছে যে পিছিয়ে আসার কোন উপায়ই ছিলনা। বাধ্য হয়ে তাকে ভিয়েৎনামে আরও মার্কিন সৈন্য পাঠাতে হলো। দেখতে দেখতে সৈন্য সংখ্যা ৭৫ হাজার ছাড়িয়ে গেল। অষ্ট্রেলিয়া একদল সৈন্য পাঠালো। ভারী ভারী জেট বিমান থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বন-জঙ্গল চষে ফেলতে লাগল। সপ্তম নৌবহরের জাহাজ থেকে কূল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গোলা-গুলি বর্ষিত হতে লাগলো। ওদিকে উত্তর ভিয়েৎনামের ভেতরে, আরও ভেতরে, এমন কি চীনের সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে, মার্কিন বিমান বোমা ফেলে আসতে লাগল। হ্যানয়ের কাছে একটি ক্ষেপণাস্ত্র তারা উড়িয়ে দিল।

কিন্তু তবুও ওপক্ষ থেকে আলোচনার জন্যে কোন আগ্রহই দেখা যাচ্ছেনা।

আমেরিকা ওদের এতটা প্রতিরোধ আশা করেনি। কিন্তু এখন সে নিজের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। চরম শক্তির পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ায় চরমতম শক্তির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া এখন তার আর কোন উপায় নেই। তাই ফলাফলের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও, প্রেসিডেন্ট জনসনকে জুলাইর শেষে ঘোষণা করতে হয়েছে যে আমেরিকা ভিয়েৎনামে তার সৈন্যশক্তি ব্যাপকভাবে বাড়াতে চলেছে, এবং আরও ৫০ হাজার সৈন্য সেখানে পাঠানো হবে।

কিন্তু শত্রুপক্ষ আলোচনায় বসতে এখনো রাজী নয়। বরং গত কয়েক সপ্তাহে দানাংয়ের আশেপাশে, সায়গনের কাছাকাছি ও মধ্যদেশীয় পার্বত্য প্রদেশগুলিতে ভিয়েৎকংদের তৎপরতা যেরকম নাটকীয় ও দুঃসাহসিকভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে একথাই মনে হয়ে যে, তাদের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে।

আমেরিকা এখন কি করবে? তার পক্ষে এ এক মস্ত বড় চাপ। ঘরের খেয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বন থেকে কমুনিজমের মোষ তাড়াতে তার প্রত্যেকদিন দেড় কোটি টাকা খরচা করতে হচ্ছে। যুদ্ধ সেখানে যত ঘনিয়ে উঠছে রাশিয়ার সঙ্গে উন্মুক্ত বিরোধের সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাচ্ছে, পশ্চিমী মিত্রদের মধ্যে ফাটল ততই প্রসারিত হচ্ছে, নিরপেক্ষ দেশগুলির চোখে আমেরিকার সুনাম ততই নষ্ট হতে চলেছে।

কিন্তু আমেরিকা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তাকে আক্রমণ তীব্রতর করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা তাকে আরও বেশী সংখ্যায় সৈন্য আমদানী করতে হবে। এটা নিশ্চয়ই তার পক্ষে খুব সুখকর নয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের চাহিদা মেটাতে রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের ভেতর থেকেই তাতে প্রবল আপত্তি ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি তাকে বাতিল করতে হয়। তার বদলে তাকে সৈন্য সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণ করবার নির্দেশ দিতে হয়েছে। অবস্থা আরও খারাপ হলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহের কাজেও পুরোপুরি নামতে হবে।

এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে—যেখানে মার্কিন উপকূল থেকে ন' দশ হাজার মাইল দূরে অপরিচিত বনে-জঙ্গলে মার্কিন জীবন দলে দলে বিসর্জন দেওয়া ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে—প্রেসিডেন্ট জনসন কি করতে পারেন?

প্রেসিডেন্ট জনসন পুরোপুরি ক্ষমতায় আসার পর এই দশ মাসে ভিয়েৎনামে মার্কিন প্রতিশ্রুতি এমনভাবে বেড়ে গেছে যা গত ১১ বছরে হয়নি। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমল পর্যন্ত ভিয়েৎনামে আমেরিকার ভূমিকা ছিল প্রধানত উপদেষ্টা-মূলক, এবং প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারাও সেনেটের আর্মড সার্ভিসেস কমিটির কাছে এক জবানবন্দীতে স্পষ্টই বলেছিলেন, দূর থেকে সাহায্য করা ছাড়া ভিয়েৎনামে সামরিক দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া আমেরিকার পক্ষে ঠিক হবেনা, কারণ তাতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে।

তাসত্ত্বেও জনসন যুদ্ধের ধারা পাল্টাতে চাইলেন।

এক, তাঁর বদ্ধমূল ধারণা কম্যুনিষ্টরা ভিয়েৎনামে তাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের দ্বিয়োরীর একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা ক'রে নিতে চায়;

দুই, যদি এখনই ঐ চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত জবাব না দেওয়া যায় তবে কেবল গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই বিপন্ন হয়ে পড়বে তা নয়, স্বাধীন দুনিয়ার প্রতিভূ হিসেবে আমেরিকার সম্মান একটা চূড়ান্ত আঘাত পাবে। তখন অন্য কোথাও

সরে গিয়ে ব্যূহ রচনা করলেও কোন লাভ হবে না, কারণ "মিউনিকে হিটলারের কাছ থেকে আমরা শিখেছি আক্রমণ সফল হলে আক্রমণকারীর ক্ষুধা আরও বেড়ে যায়।"

গত মার্চে হনোলুলুতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা, তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সওয়েল টেলর ও পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের এক গোপন বৈঠকে ভিয়েৎনামে আমেরিকার নতুন ভূমিকা ঠিক হয়ে গেল। যে মার্কিন ঘাঁটি ইত্যাদি প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল, এবার তারা ভিয়েৎকংদের খুঁজে বার করে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালাবে। স্বভাবতঃই সৈন্যসংখ্যা না বাড়ালে নয়, এবং দেখতে দেখতে সে সংখ্যা বেড়ে চলল। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জনসনের খাস কামরার সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ওয়েস্টমোর-ল্যাণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলো। পেন্টাগনের ওয়ার রুমে ভিয়েৎনামের জন্যে একটি নতুন সামরিক ষ্ট্র্যাটিজিও ঠিক হয়ে গেল। তার নাম দেওয়া হলো 'ইঙ্ক ব্লক ষ্ট্র্যাটিজি'। ব্লটিং পেপারের ওপর কালির ফোঁটা ফেললে সেগুলো যেমন ধেবড়ে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ একে অন্যটার সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে যায়, তেমনি পেন্টাগনের অফিসাররা ঠিক করলেন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমগ্র উপকূল ঘিরে মালার মতো পর পর মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন করা হবে; তারপর সেখান থেকে গেরিলা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আশেপাশের জায়গাগুলিকে গেরিলামুক্ত করতে করতে ঐ ঘাঁটিগুলির এলাকা বাড়িয়ে বাড়িয়ে যাওয়া হবে। শেষে এমন একটা সময় আসবে যখন ঐ ঘাঁটিগুলির এলাকা পরস্পরকে ছুঁয়ে একপ্রকার হয়ে যাবে এবং এইভাবে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গেরিলামুক্ত হবে।

সেই সঙ্গে ভারী ভারী জেট বোমারু বিমান আমদানী করা হলো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হলো বি-৫২ জেট। আজ যদি পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ লাগে তবে এই বি-৫২ কেই পারমাণবিক অস্ত্র বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলার কাজ অনেকখানি করতে হবে। গুয়ামের ঘাঁটি থেকে উড়ে এসে এই বি-৫২ বিমান-গুলি এ-পর্যন্ত বোধ হয় সাত আটবার ভিয়েৎনামের জঙ্গলে হানা দিয়ে হাজার হাজার পাউণ্ডের বোমা বৃষ্টিধারার মতো ফেলে গেছে।

আগে অস্ত্রসস্ত্র ও রসদ সায়গন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মারফৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যুদ্ধরত সৈনিকদের ও গ্রামবাসীদের সরবরাহ করা হ'তো; এখন সায়গনের মার্কিন কর্তৃপক্ষ সরাসরি এই দায়িত্ব বহন করছেন।

পেন্টাগনের নীতি-নিয়ামকরা বলে আসছেন, যদি তাঁরা গেরিলাদের ওপর

সৈন্যসংখ্যার দিকে ১০—১ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন, তবে ভিয়েৎনামের লড়াই তাঁরা জিতবেনই। প্রেসিডেন্ট জনসন এখন এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার দিকে চলেছেন। তিনি অবিলম্বে ভিয়েৎনামে সৈন্যসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ঐ সংখ্যায় পৌঁছতে আর দু'মাস সময় লাগবে। তিনি আশা করছেন, ঐ বাড়তি ৫০ হাজার সৈন্য পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে লড়াইর গতি অন্তত কিছুটা পরিবর্তিত হবে এবং ভিয়েৎকংরা ক্রমশঃ একটা আপোষ মীমাংসার দিকে আসতে বাধ্য হবে।

একটা কথা প্রথমেই মনে রাখা ভালো যে, গেরিলা যুদ্ধে আমেরিকার হাতেখড়ি এই প্রথম। অতীতে আর কখনো সে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, কাজেই তার সামরিক বাহিনীও এভাবে গড়ে ওঠেনি। ওয়েস্ট পয়েন্টের পাঠ্যপুস্তকে আফিসাররা যে সব কলা-কৌশলের তালিম দেন এবং সাধারণ সৈন্যদের যে ধরণের তালিম দেন তার থেকে গেরিলাদের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ পৃথক। ভিয়েৎ-নামের লড়াইয়ে এটা আমেরিকার মস্ত বড় দুর্বলতা।

তাছাড়া, যে কোন লড়াইয়ে আক্রমণকারীরা সব সময়েই, অন্তত গোড়ার দিকে, সুবিধে পেয়ে থাকে। তার ওপর আক্রমণকারী যদি গেরিলা হয় তাহলে তো কথাই নেই। কোন দিক থেকে কিভাবে এবং কখন আক্রমণ আসবে মামুলী কলাকৌশলের জ্ঞান নিয়ে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

তৃতীয়ত, দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি যদি গেরিলাদের সহায়ক হয় তাহলে দুর্ধর্ষতা ও কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায়। থার্মোপেলির বীরত্ব কেবল তার ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থত, গেরিলারা যদি একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী না হয়, যদি তাদের পেছনে জনসাধারণের একটা বড় অংশের সমর্থন থাকে, তবে তারা প্রায় অপরাজেয় হয়ে পড়ে।

ভিয়েৎনামে এই চারটি জিনিসই গোড়া থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল।

হঠাৎ এক এক দল যুবক—গেরিলা কায়দা-কানুনে যারা প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—এমন একটি দেশে লড়াইয়ের জন্যে আসছে, যে দেশকে তারা চেনে না, যার বন-জঙ্গল, মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত তাদের জানা নেই, যেখানে শত্রু আক্রমণ চালাবার উপায় নেই, যেখানে ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত কেবল শত্রুর অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, এবং যেখানে রাস্তার ভীড়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে প্রায়ই বলতে

শোনা যায় : ঐ ভীড়ে কয়েকজন ভিয়েৎকং নেই তা কে বলতে পারে?

অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা যেখানে ২৪ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতি পদে, সেখানে স্থলযুদ্ধ পরিচালনা করা একটা সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার। আমেরিকানরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, ভিয়েৎকংরা হচ্ছে "অতর্কিত আক্রমণের সেরা শিল্পী"। ওদের আক্রমণের পদ্ধতি এত নিপুণ যে কোন কনভয় বা কোন সৈন্যদলকে ওরা একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে তবে ছাড়বে। এই ধরণের প্রতিকারহীন অতর্কিত আক্রমণ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে হরদম ঘটছে। এই ধরণের আক্রমণের একটা সুবিধে এতে বেশী লোকের দরকার হয় না। আধ ডজন গেরিলাই হয়ত একটা বিরাট অ্যামবুশের পক্ষে যথেষ্ট। যদি ওরা মারাও যায় তবু সরকার পক্ষের ক্ষতির তুলনায় তা কিছুই নয়।

গত ১৭ই জুন আমেরিকা ভিয়েৎনামে প্রথম বি-৫২ ভারী জেট বোমারু বিমান আমদানী করে। সেদিন অনেকগুলি বি-৫২ একের পর এক হানা দিয়ে বিনহুয়োং প্রদেশের রাজধানী বেনকাটের উত্তর দিকে দুই বর্গ মাইলের একটি জঙ্গল এলাকা ১৫০ ও ১০০০ পাউণ্ডের বোমা ফেলে একেবারে চষে ফেলেছিল। সেদিন পর্যন্ত এত নিবিড় আক্রমণ ভিয়েৎনামে আর কখনো হয়নি। কিন্তু পরে জানা গেল যে ঐ ব্যাপক আক্রমণ সত্ত্বেও একটি গেরিলাও সেখানে মারা পড়েনি; জঙ্গল এতই ঘন ছিল।

এ ছাড়াও একটা কথা আছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের প্রভাব বা প্রতিপত্তি যদি কিছু থাকে তবে তা শহর অঞ্চলগুলিতেই। এবং স্বভাবতই মার্কিন উপস্থিতি যদি কোথাও কার্যকর হতে পারে তবে প্রধানত ঐ শহর অঞ্চলগুলিতেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই গ্রাম, পাহাড় এবং বনভূমি। সেখানে সায়গনের ফতোয়ার প্রবেশ নেই। এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে আজ পর্যন্ত সায়গনের কোনা পদার্পণই ঘটেনি, যেখানে সায়গনের আইন ও শৃঙ্খলা, সায়গনের অনুশাসন, সায়গনের তৎপরতা একেবারেই অনুপস্থিত। সেই সব এলাকায় ভিয়েৎকংদের একচ্ছত্র রাজত্ব। সেখানকার গ্রামবাসীরা ভিয়েৎকং ছাড়া আর কাউকে দেখেনি, ভিয়েৎকং ছাড়া আর কারো প্রচার শোনেনি, ভিয়েৎকং ছাড়া আর কোন সত্যের কথা জানেনা।

কেবল প্রচার নয়, ভিয়েৎকংরা সায়গনের প্রশাসনের এই দুর্বলতার সুযোগ আরো অনেকভাবে নিয়েছে। তারা গ্রামে গ্রামে স্কুল বসিয়েছে, হাসপাতাল করে দিয়েছে। বিশেষ ক'রে ১৯৫৯-৬০ সালে ওরা ঐ সব সুদূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক

ভূমি সংস্কার সাধন করেছে। অত্যাচারী শোষক জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। এগুলি কম্যুনিষ্ট কৌশল হ'তে পারে, কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের কাছে কোন ইজম নেই। যে তাকে জমি দেবে, ক্ষুধার অন্নের অন্তত একটা ন্যূনতম সংস্থান ক'রে দেবে, তাকেই সে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। এবং স্বভাবতই কোন আদর্শের দ্বন্দ্বে সে তারই পক্ষে থাকবে। ভিয়েৎকংরা এই ভাবেই দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রকৃতির নিয়মে কোথাও কোন শূন্যতা থাকতে পারে না। সায়গন যদি শূন্যতা পূরণ করে উঠতে না পারে তবে ভিয়েৎকংরা সে স্থান দখল করে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

এই পরিস্থিতি আজ সায়গনকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে সেটা একবার গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। একথা আজ কোন বিতর্কের অপেক্ষা রাখেনা যে, নিজের দেশের গ্রামাঞ্চল থেকেই সায়গনের প্রতিভূরা আজ বিতাড়িত। তাদের যেটুকু দখল আছে তা ঐ শহরে এলাকাগুলিতে। ওঁদের বিশ্বাস আছে, ঐ এলাকাগুলি যদি তাঁদের দখলে থাকে তবে দেশটাকে মোটামুটি শাসনে রাখা যাবে। কিন্তু যদি ঐ এলাকাগুলি কোনদিন তাদের হাতের বাইরে চলে যায়? পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরাই এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে যদি কোনদিন শহর এলাকাগুলির ওপর থেকে কর্তৃত্ব চলে যায়, তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিকাংশই সায়গনের দখলের বাইরে চলে যাবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মোট ৪৫টি প্রদেশ আছে। স্বভাবতই ৪৫টি প্রাদেশিক রাজধানীও আছে। ঐ প্রদেশগুলি ২৪০টি জেলায় বিভক্ত। এবং স্বভাবতই ২৪০টি জেলা সদরও আছে। আরো কিছু সহর আছে, কিন্তু এগুলিই প্রধান। সায়গনের প্রভাব যদি কিছুমাত্র বিস্তৃত থাকে তবে এই ২৮৫টি শহরকে ঘিরে। এই ২৮৫টি শহরকে নিয়ে সায়গন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম শাসন করছে। এই ২৮৫টি শহর কিংবা এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি বেদখল হয়ে যায় তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সায়গনের প্রশাসনিক যোগাযোগ খুব বেশী থাকবেনা।

আমি আগেই বলেছি ভিয়েৎকংদের কতগুলো প্রাথমিক সুবিধে আছে, যেগুলি আমেরিকানদের নেই। যদি গেরিলা পর্যায়েই লড়াই চলে তবে কুড়ি বছর পরেও ঐ সুবিধেগুলি না থাকার কোন কারণ নেই। ভিয়েৎনামের লড়াই সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ মূল কথাটি সব সময়েই মনে রাখা দরকার। আমেরিকার গেরিলা যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নেই। হাওয়াইতে একটি গেরিলা-শিক্ষণ কেন্দ্র আছে বটে কিন্তু

সেখানকার শিক্ষার সঙ্গে ভিয়েৎনামের বাস্তব পরিস্থিতির আকাশ পাতাল তফাৎ। অবশ্য এক বছর ধরে লড়াই করে মার্কিন সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে একটা হাতে কলমে শিক্ষা হচ্ছে বটে এবং অনেক আমেরিকান বলে থাকেন ভিয়েৎনামে লড়াই চলতে থাকায় তাঁদের কোন অসুবিধা নেই ; বরং তাঁদের একটা মস্তবড় লাভ হচ্ছে, তাঁদের সৈন্যরা হাতেকলমে শিখবার একটা মস্তবড় সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে সব মার্কিন সৈন্য পাঠানো হয় একবছর পর তারা অন্য জায়গায় চলে যায়, ভিয়েৎনামে আর তাদের আসতে হয় না। এই একবছরে বেশ কিছুটা সময় তাদের চলে যায় ভিয়েৎনাম নামক দেশটার সঙ্গে পরিচিত হতে ; তার পর যখন তারা একটু বুঝতে সুঝতে আরম্ভ করে তখনই তাদের চলে যাবার সময় হয়। এই অবস্থায় তারা সত্যি কতখানি উপযোগী হতে পারে সেটা গভীর চিন্তার বিষয়।

পেন্টাগণ অবশ্য একটা কাজ করতে পারে : বর্তমান নিয়ম পাল্টে একজন সৈন্যকে দু'বছর কি আরো বেশী সময়ের জন্যে ভিয়েৎনামে থাকবার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে খাস আমেরিকায় যে সমালোচনার ঢেউ উঠবে সেটা পেন্টাগণ যদিও বা সামলাতে পারে, প্রেসিডেন্ট জনসন কিছুতেই পারবেন না। কারণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার ক্রমশ জড়িয়ে পড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই সেখানে ক্রুদ্ধ আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে।

কাজেই একথা যদি বলা হয় যে আমেরিকার পক্ষে ভিয়েৎকংদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের লড়াইয়ে সমান সুদক্ষ হয়ে ওঠা অসম্ভব, অন্তত সে রকম হতে তাদের সাংঘাতিক বেগ পেতে হবে, তবে খুব ভুল বলা হবে না।

ব্যাপারটা আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। ভিয়েৎকংদের হাতে মর্টার বাজুকা ইত্যাদি আছে সত্যি, কিন্তু তারা কোন প্লেন বা হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে না। অপর পক্ষে ভিয়েৎকংদের বিরুদ্ধে আক্রমণে আমেরিকার পক্ষে প্রধান ভূমিকাই গ্রহণ করছে তার প্লেন ও হেলিকপ্টার। যদি সমানে সমানে লড়াই করতে হয় তবে আমেরিকার হাতে প্লেন ও হেলিকপ্টার থাকা চলেনা। যদি সেরকম কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যদি আমেরিকাও কেবল মর্টার আর বাজুকা নিয়ে ভিয়েৎকংদের সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্যে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, তবে কি হবে ?

এক কথায় বলা যায়, মারাত্মক পরাজয়। কারণ ভিয়েৎকংরা ঐ সব বলা আর জঙ্গলের সন্তান ; আমেরিকানরা বাইরে থেকে এসেছে, কাজেই সে ঘরের সঙ্গে অপরিচিত। তাছাড়া ভিয়েৎকংদের লড়াইয়ের নীতির সঙ্গে আমেরিকানদের

পাঠ্য পুস্তকের শেখা বিদ্যার কোনখানে মিল নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কে ভিয়েৎকং আর কে নয়, আমেরিকানদের, এমনকি দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যদের পক্ষেও তা চেনা মুস্কিল। অপর পক্ষে ভিয়েৎকংদের পক্ষে আমেরিকানদের চেনা খুবই সহজ।

এ সব যুক্তি সত্ত্বেও হয়তো তর্কের খাতিরে আমরা মেনে নিতে পারি যে, ১০—১ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারলেই আমেরিকা ভিয়েৎনামের লড়াই জিততে পারবে। কিন্তু সেটা নিতান্তই তর্কের খাতিরে। আসলে মুখে এই ১০—১ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কথা বললেও আমেরিকা সত্যিই কতদূর যেতে পারে ?

তথ্যাভিজ্ঞ এবং প্রামাণ্য মহলের মতে হার্ড কোর ও মিলিশিয়া নিয়ে ভিয়েৎকংদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। ১০—১ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে দরকার অন্তত দশ লাখ সৈন্যের।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২৭ হাজার। এছাড়া আছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার সিভিল গার্ড : মার্কিন কর্তৃপক্ষ সরাসরি ওদের বেতন দিয়ে থাকে। তাছাড়া প্রায় ৩০ হাজার ভিয়েৎনামীকে পুলিশ ডিউটির জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে এদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৫ হাজার করার কথা আছে।

যদি ধরে নিই যে ঐ ৩০ হাজার পুলিশ ডিউটির লোককেও লড়াইয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়—মনে রাখবেন সে ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের নিরাপত্তা অনেকখানি বিঘ্নিত হবে, তবুও যদি তাদের সৈন্য হিসাবে ধরা হয়—তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কর্তৃপক্ষ বড় জোর ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার লোককে লড়াইয়ে পাঠাতে পারে। ভিয়েৎনামে ইতিমধ্যেই আমেরিকার ৭৫ হাজার সৈন্য আছে। প্রেসিডেন্ট জনসন অবিলম্বে আরো ৫০ হাজার সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তাতে মার্কিন সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াবে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সব মিলে তাহলে এপক্ষে পাওয়া যাবে ৬ লক্ষ ১২ হাজার সৈন্য। ১০—১ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে আরো ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার সৈন্য প্রয়োজন। এই সৈন্য প্রধানত আমেরিকাকেই জোগাতে হবে। কারণ এখন এ যুদ্ধ প্রধানত আমেরিকারই। তাছাড়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনীর বর্তমান মনোবল যে রকম দুর্বল তাতে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করা সায়গনের পক্ষে মোটেই সহজ হবে না।

উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর বোমা ফেলে ওয়াশিংটন একটা ওস্তাদি চাল চেলেছিল। সে চাল স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার

সিদ্ধান্ত নিয়ে সে আরেকটি মোক্ষম চাল চেলেছে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, উত্তর ভিয়েৎনাম আবার সেই চাল ওয়াশিংটনের দিকেই সরিয়ে দেবে। তখন জনসনের পক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ আরো জোরদার করা এবং দক্ষিণে সৈন্য সংখ্যা আরো বাড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না কিন্তু তাতেও যদি হ্যানয় নিজে থেকে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তন না করে, তবে জনসন নিজের ফাঁদে আরও জড়িয়ে পড়বেন, এবং লাখ লাখ মার্কিন সৈন্য ব্যর্থতার কলঙ্ক নিয়ে ভিয়েৎনামের জলায় আর জঙ্গলে আটকে নিষ্ফল হাত-পা ছুঁড়বে।

কিন্তু মনে হয়, এই বৃহত্তর ব্যর্থতা ডেকে আনার জন্যে প্রেসিডেন্ট জনসন অপেক্ষা করবেন না। তিনি নিজে থেকেই যুদ্ধের প্রকৃতি পাল্টে দিতে চাইবেন। কারণ তা ছাড়া ভিয়েৎনামের জল-জঙ্গল থেকে সম্মানজনকভাবে বেরিয়ে আসার কোন উপায় তাঁর নেই। লড়াইকে তিনি এমন একটা পর্যায়ে নিতে যেতে চাইবেন, যেখানে গেরিলা তৎপরতার খুব বেশী মূল্য থাকবে না, যেখানে তিনি অবাধে শত্রু পক্ষের ওপর যে রকম খুশি আক্রমণ হানতে পারবেন, যেখানে মামুলী সামরিক শক্তির ভিত্তিতেই জয় পরাজয়ের মীমাংসা হবে, যেখানে শত্রুর অপেক্ষায় না থেকেই নিজে আক্রমণ আরম্ভ করা যাবে।

এর কাঁদুনি ইতিমধ্যেই গেয়ে রাখা হয়েছে। সায়গন ঘোষণা করেছে, গেরিলাদের যদি অন্য রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং যদি বাইরের কোথাও থেকে গেরিলাদের সাহায্য দেওয়া হয় তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার সেই রাজ্য আক্রমণ করবেন।

উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর আক্রমণ করে একটা নজীর ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। এরপর লাওস ও কম্বোডিয়ার সেই নজীরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, কারণ 'হো চি মিন সড়ক' এই দুটি দেশের ভেতর দিয়েই প্রসারিত। এবং এটা ঠিক যে লাওস ও কম্বোডিয়ার ওপর বোমা পড়ার পর চীনকেও একটু তৎপর হতে হবে। ঐ নজীরের দোহাই দিয়ে চীনের ওপরে আঘাত হানার অধিকারও তখন আমেরিকা দাবী করবে। এবং তখন ভিয়েৎনামের লড়াই আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এবং তার ফয়সালাও নিশ্চয়ই সেখানকার জলে-জঙ্গলে হবে না।

কাজেই আমরা চাই বা না চাই, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ঘিরে একটা দ্বিতীয় কোরিয়ার দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি। আমেরিকা যদি ভিয়েৎনামে তার সম্মান রক্ষার জেদ না ছাড়ে, তবে এ ছাড়া আর কোন পরিণতির কথা এই মুহূর্তে

আমরা চিন্তা করতে পারছি না।

অবশ্য হ্যানয় যদি আমেরিকার হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে আপোষ আলোচনায় বসতে রাজী হয় তবে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াতে পারে বটে, কিন্তু আমরা জানি, হ্যানয় ভিয়েৎনামে আমেরিকার উপস্থিতি মেনে নিয়ে আলোচনায় বসতে কিছুতেই রাজী হবে না। এবং ইতিহাস অন্তত বলবে, হ্যানয়ের এই জেদ নিছক গোঁয়াতুর্মি নয়।

রাষ্ট্র, পঞ্চমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৭২

** সাম্প্রতিক বিশ্বে ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও মানবতার এক সঙ্কট উপস্থিত। এবং এ-সঙ্কট শুধুমাত্র ভিয়েৎনামের সঙ্কট নয়। এ-সঙ্কট পৃথিবীর স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রের। আমাদেরও। ভিয়েৎনাম আপাতত যুদ্ধক্ষেত্র। কেউ কেউ বলছেন, এ-যুদ্ধ সমগ্র এশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীর বজ্রমুষ্টি ক্রমেই শিথিল হয়ে গেল—মানুষ জাগল। এল নতুন মূল্যবোধ, স্বাধীনতা-গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলোর প্রতি মানুষের নতুন আস্থা। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে, পশুশক্তি দিয়ে মানুষের জাগরণকে দমন করা যায় না। ফলত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার ঘরে ঘরে এল স্বাধীনতা।

ভিয়েৎনামের মানুষ দীর্ঘদিন সেই স্বাধীনতাই চাইছে। সাম্রাজ্যবাদীর কবলে পড়ে সে নানাভাবে বিপর্যস্ত। সর্বাঙ্গে তার নানা ক্ষতচিহ্ন। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ভিয়েৎনামে দীর্ঘদিন অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে; পরবর্তীকালে জাপান; তারপরে আবার ফরাসী অত্যাচার; বর্তমানে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর মিত্র আমেরিকা। দেশ বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু জেনেভাচুক্তির মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। উত্তর ভিয়েৎনাম স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ আশ্রিত রাজ্য। তাই গত দশ বৎসরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার ৬০০ কোটি ডলারের ওপর সামরিক সাহায্য, ৯৪টি নতুন বিমানঘাঁটি। একের পর এক পাপেট সরকার। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মৃত এবং পঙ্গু, নারীধর্ষণ, শিশুর ওপর অত্যাচার, নাপাম বোমার ব্যবহার, বিষাক্ত গ্যাসপ্রয়োগ। সাম্প্রতিক ইতিহাসে

এমন বীভৎস ঘটনা আর দ্বিতীয় ঘটেনি। কেনেডি সাহেব যুক্তি দেখিয়েছিলেন—'The US is determined to help Vietnam preserve its independence, protect its people against Communist assassins and build a better life through economic growth.' স্বাধীনতা গণতন্ত্র মানবতা জিন্দাবাদ!

তথাপি ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলেছেন। সংশপ্তক সেনা সব। যতখানি খবর পাওয়া গেছে, মুক্তিযোদ্ধারা সর্বত্রই বিপুল বিজয়ের মুখোমুখী। সাম্রাজ্যবাদীর চরম আঘাত বুকে নিয়ে ও নানা প্রতিকূলতার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন নারী-পুরুষের এমন সংগ্রাম কোন দেশে দেখা যায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে রয়েছে দেশ, দেশের স্বাধীনতা-গণতন্ত্র; মানবতার প্রশ্ন তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোত। অথচ আমেরিকা সুকৌশলে নির্লজ্জভাবে স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ ভূমিকার কথা প্রচার করছে। কিন্তু সে-স্বাধীনতা কাদের স্বাধীনতা? আমেরিকা তো ভিয়েৎনামের জনসাধারণের জীবন সমস্যার শরীক নয়!

কিন্তু তথাপি ভিয়েৎনামের ঘটনা সমস্ত পৃথিবীর সৎ ও বিবেকবান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসছে—পশুশক্তির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এমন কি খাস আমেরিকায় জনসন বিরোধী বিক্ষোভও দানা বেঁধে উঠছে। সে-দেশের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষ মার্কিন নীতির প্রতি ধিক্কার হানছেন। ছাত্রেরা বলছেন, 'এই নোংরা ফ্যাসীবাদী যুদ্ধে আমরা অংশ গ্রহণ করবো না।' তাঁরা আরো প্রস্তাব করেছেন, স্পেনের মত আন্তর্জাতিক বিগ্রেড গঠিত হোক, তাঁরা তাতে যোগ দিয়ে ভিয়েৎনামী মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। রাসেল সাহেব বলেছেন, 'শয়তানীর এই সর্বব্যাপী সাম্রাজ্যকে বাধা দেবার জন্য কিছু করা যায় কি? অবশ্যই এর প্রথম পদক্ষেপ হোল ভিয়েৎনামের জনসাধারণকে তাঁদের স্বাধীনতা জয়ের ও রক্ষার লড়াইতে সাহায্য করা……'ইত্যাদি।

আমরা সব সময় স্বাধীনতা জয় ও রক্ষার সংগ্রামে ভিয়েৎনামী মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। কেননা সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নগ্নতা আমরা দেখেছি আমাদের দেশে—এশিয়ার মাটিতে, আফ্রিকায়। আমরা জানি, ওদের নখ-দন্ত হিংস্র পশুর চেয়েও তীক্ষ্ণ। আমরা বিশ্বাস করি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাওয়া, নিজের দেশকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করার শপথ মন্ত্রোচ্চারণের মত পবিত্র। ভিয়েৎনামে সে-মন্ত্রোচ্চারণ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশ বিভক্ত হয়েছে

সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে এবং আমাদের তৎকালীন নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতায়। বাহ্য কারণ, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য। ভিয়েৎনামে এমন কি ধর্মের যুক্তিও অনুপস্থিত। একই দেশ বিভক্ত হয়েছে কেবল সাম্রাজ্যবাদীর রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির জন্যে। এ বিভাগ কৃত্রিম। একে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ ভিয়েৎনামের সংগ্রামী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার না করা। আমরা সত্যভ্রষ্ট হতে চাই না।

এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথের মত আমরা আরো বিশ্বাস করি—'যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ-আশা দুরাশা নয়, বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষকথা হতে পারে না; তাহলে মানুষ বাঁচত না।'

বোবা কাহিনী ও জীবনকথা

সেদিন বোধহয় বেশি দূরে নেই যেদিন বাংলা দেশের গ্রামকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ এ নয় যে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে উন্নত গ্রামগুলি শহরের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। এর কারণ ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে শহর ও গ্রামের অবাস্তব সহ-অবস্থান ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে। গ্রামের অবক্ষয়ের স্পষ্ট সূত্রপাত কবে থেকে হয়েছে তার ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্ভব কিনা জানি না, কাজ চালানোর সুবিধার জন্য একটা মোটামুটি সময় সীমা বেছে নেওয়া যেতে পারে—প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর থেকে এই অবাস্তব সহ-অবস্থান ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি রাজনীতি সাহিত্য প্রমোদ বিলাস ক্রমশই শহরে এসে ভিড় করতে থাকল এই সময় থেকে। এই সময় থেকে (সময় সীমাটি নিতান্তই কাজ-চালানোর সুবিধা সাপেক্ষে নির্ণীত হয়েছে, কেউ দু-দশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেলে আপত্তি করবার কিছু নেই) গ্রাম বলতে যে-ছবি আমাদের স্মৃতি পটে টিঁকে রইল তা হল, সেখানে যেন নিত্য প্রভাতে

পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়
পাচন হাতে রাখাল ছেলে গোরু চরাতে যায়।

অর্থাৎ সূর্য উঠছে, সূর্যের কোল ঘেঁষে একটা আঁকাবাঁকা লাল কাঁকরের পথ গ্রামে প্রবেশ করেছে, সেই পথ দিয়ে এক সুস্থ সবল যুবক দশহাতী পরিষ্কার ধুতি প'রে কাঁধে লাঙল নিয়ে দুটি হৃষ্টপুষ্ট বলদ সন্তানের পিছনে পিছনে চলেছে—এই হল গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের চিত্তপটে মুদ্রিত স্থির ও স্থায়ী চিত্র। এই অবাস্তব চিত্রের মোহ নিয়ে কিছু কাব্য সাহিত্য লেখা হল বটে, কিন্তু গ্রাম শহরের সহ-অবস্থান ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, যার প্রান্তবিন্দু হল গণেশ অ্যাভেনিউ-এর মোড়ে ঝকঝকে 'খাদি গ্রামোদ্যোগ'-এর দোকানটির উদ্বোধন। গ্রামোন্নয়নের হেড কোয়ার্টার্স হল শহর কলকাতা। গ্রাম পর্যবসিত হল মনোহারী দোকানের আলমারির মতো সাজানো পাঁচ মুড়ির ঘোড়ায় আর কনফারেন্সের গেটে খড় আর বাঁশের আরকিটেক্চারে। গ্রামকে হারানোর জন্য ভাবাবেগসর্বস্ব খেদ প্রকাশ অর্থহীন, কিন্তু গ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপট্যের প্রতিবাদ করার সময়

এসেছে। গ্রামের প্রতি অবিশ্বাসী অনান্তরিক মন নিয়ে যাঁরা গ্রামচর্চা করেন তাঁদের ক্ষমা করা যায় না কিছুতেই। গ্রাম আজ আমাদের চোখ থেকে সরে গেছে, মন থেকেও সরছে, তাই তাকে খুঁজতে হয় সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। গ্রামের অবক্ষয়ের জন্য দুঃখবিলাস ইতিহাস চেতনার পরিপন্থী, কিন্তু গ্রাম জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত ঔদাসীন্য ইতিহাসের জ্ঞানকেই অস্পষ্ট করে রাখে। ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে বহুক্ষেত্রেই সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলার গ্রামের সাক্ষ্য খুব বেশি নেই বাংলার সাহিত্যে। কয়েকখানি মাত্র বইয়ের উল্লেখ করা চলে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, তারাশঙ্করের হাঁসুলিবাঁকের উপকথা বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি। ভাবতে খুব অবাক লাগে যে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের অকুস্থল গ্রাম হ'লেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রামগুলিকে বাংলা দেশের মানচিত্রে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সহজ নয়। 'দত্তা'র গ্রাম খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা রীতিমত গবেষণা সাপেক্ষ। পল্লী সমাজের পল্লীটি ঠিক কোন্‌টি নির্দিষ্ট ক'রে বলা কঠিন। কথাটার অন্য অর্থ করতে চেষ্টা না করলে বলা যায়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গ্রাম্যতা আছে কিন্তু নির্দিষ্ট গ্রাম নেই। শরৎচন্দ্রের পূর্বপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রেও গ্রামের নির্দিষ্ট সন্ধান অনুপস্থিত।

যে-চারখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে সে ক' খানিতেই তালিকার সম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই নেই এবং এই চারখানি গ্রন্থে গ্রামের যে-পরিচয় আছে তাও এক অঞ্চলের, এক যুগের বা এক দৃষ্টিভঙ্গীর নয়। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির রচনা-কাল গত শতাব্দীর শেষ অধ্যায়। চিঠিগুলিতে বিস্ময়মুগ্ধ রোমান্টিক মনের আন্তরিক ভালোবাসার কাব্যিক প্রকাশ আছে। সে গ্রাম সে প্রকৃতি আজও আছে কিনা জানিনা (প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়, যে-আকাশের রক্তিম আভায় সন্ধ্যা শান্ত চরণে নতনেত্রে দিবসের অনুগমন করত, সেখানে হয়তো আজ চিমনির ধোঁয়া লজ্জার স্বর্ণাভ আভার মুখে দিনরাত্রি কালি ওগরাচ্ছে)—সে ছবি থাকলেও আমরা দেখবার চোখ হারিয়েছি। তবু ছিন্নপত্রে আমাদের লাভ উত্তর বঙ্গের পদ্মাতীরের বাংলা দেশকে এমন আন্তরিকভাবে আর কোথাও আঁকা হয় নি, সেঁথানে যাবার একটা সহজলভ্য পাসপোর্ট রয়ে গেল ছিন্নপত্র বইয়ে। ছিন্নপত্রের যুগে তখনও গ্রামের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ ঘটে নি, আত্মীয়তা তখনও অক্ষুণ্ণ। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর হরিহর কিন্তু জীবনধারণের অবলম্বনের অভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হল। ছিন্নপত্রে উত্তর-পদ্মার

গ্রাম বাংলা আর পথের পাঁচালীতে গাঙ্গেয় বাংলা। ছিন্নপত্র ও পথের পাঁচালী গ্রাম বাংলার দুই মহাকাব্য। পরের দু খানি উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি ও হাঁসুলি বাঁকের উপকথা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এদেরই বোধ হয় নূতন নামকরণ হয়েছে—আঞ্চলিক উপন্যাস। নিম্ন পদ্মার কথা নিয়ে পদ্মানদীর মাঝি। সে-পদ্মার পাড় নিত্য ভাঙছে আবার কোথাও চর জাগছে—সেই পাড় ভাঙা ও চর জমাকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠছে এক বিচিত্র জীবন ধারা, আসছে কত বিচিত্র মানুষ। পদ্মানদীর মাঝির ভাষা জীবন দুঃখ সমস্যা তাই নিয়ে এই উপন্যাস। হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় আছে রুক্ষ রাঢ় বাংলার গ্রাম জীবন। তাদের ভাষা কুসংস্কার জীবনধারা নিয়ে এই উপকথা। দারিদ্র্যের তাড়নায় হরিহরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল গ্রামত্যাগের, অনিশ্চিত পদ্মার সঙ্গে লড়াইয়ে হৃত সর্বস্ব হয়ে হোসেন মিঞার কপট প্রলোভনের নেশায় গ্রামত্যাগ করেছিল পদ্মানদীর মাঝি। আর হাঁসুলি বাঁকের মানুষেরা নিজেদের ইচ্ছেতে জমির দখল ছাড়ে নি, তাদের ভিটেছাড়া করল যুদ্ধ আর কারখানা। গ্রাম বাংলার কৃষক প্রতিনিধি করালীরা এরপর থেকে কারখানার শ্রমিক হল। এঘটনারও অনেক আগে এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে রাত্রে শরৎচন্দ্রের গফুর আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথার পর আরও কেউ কেউ গ্রাম বাংলার কথা বলেছেন। একজনের নাম মনে পড়ছে অমরেন্দ্র ঘোষ। কিন্তু খুব বেশি নেই। দিনে দিনে নূতন নূতন হাজারো সমস্যা এসে পড়ছে, তারই কথা লেখা হচ্ছে উপন্যাসে। গ্রাম নিয়ে আর বোধ হয় উপন্যাস লেখা হবে না, যেমন হবে না রামায়ণের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য। পশ্চিম বাংলার দিকে চেয়ে অন্তত তাই মনে হয়।

এ কথাগুলি অন্য কিছুর ভূমিকা স্বরূপ বলা হয় নি, সম্প্রতি একটি উপলক্ষ হাতে এসেছে, তারই সূত্রে এই আলোচনা। পূর্ববাংলার একখানি উপন্যাস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। জসীমউদ্দীনের বোবা কাহিনী।[১] বইখানা পড়তে গিয়ে মনে হ'ল পশ্চিম বাংলার সিদ্ধান্ত পূর্ববাংলায় সত্য নাও হতে পারে। এ প্রান্তে গ্রাম যেমনভাবে মুছে গেছে ও প্রান্তে তা এখনও যায় নি। তার একটা কারণ বোধ হয় পূর্ববাংলায় কলকাতা নেই। ঢাকা শহর কোনো বিচারেই কলকাতা নয়। পূর্ববাংলার অনেক খানি এখনও পূর্ববাংলার গ্রামে, পশ্চিম বাংলার প্রায় সবখানি যেমন শহর কলকাতায়।

১ জসীমউদ্দীন, বোবাকাহিনী, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

জসীমউদ্দীনের বোবা কাহিনী উপরে বর্ণিত গ্রন্থগুলির সমকক্ষ না হলেও সমজাতের। ত্রুটি নির্দেশের দায়িত্ব নিলে হয়তো অনেক ত্রুটি বা অপরিণতি খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না।

কাহিনীর নায়ক দুইজন আজাহের এবং তার পুত্র বছির। প্রথম ১৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রধান পুরুষ ফরিদপুরের কাছে আলিপুর গ্রামের ভূমিহীন কৃষক আজাহের—তার কাহিনী দুঃখ, সংগ্রাম ও বিপর্যয়ের কাহিনী। পরবর্তী অংশে বছিরের ক্রম সুখ বিবর্ধনের কাহিনী। সমগ্র কাহিনীটি অত্যন্ত সরল এবং গঠনেও কোথাও চমক লাগাবার চেষ্টা নেই। আজাহেরের কাহিনীর সূচনা এই রকম, 'কবে কোন চাষার ঘরে তার জন্ম হইয়াছিল, কেবা তার মাতা ছিল, কেবা তার পিতা ছিল, সে কথা আজাহের নিজেও জানে না।...স্রোতের শেহলার মত সে ভাসিয়া আসিয়াছে। এক ঘাট হইতে আর ঘাটে, এক নদী হইতে আর এক নদীতে।...কেহ তাহাকে আদর করিয়াছে, কেহ তাহাকে অনাদর করিয়াছে, কিন্তু সবাই তাহাকে ঠকাইয়াছে। এমনি করিয়া নানা লোকের কাছে ঠকিতে ঠকিতে এখন তাহার বয়স পঁচিশের কোঠায়।' এই হ'ল আজাহেরের পরিচয়। সে গ্রামের চাষীদের বাড়িতে জন বা পৈড়াত খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তার জীবনে অন্য দুঃখ নেই, অন্য আশা নেই। শুধু একটি নিজস্ব ঘর ও একটি নিজস্ব বউ—এই সে চায়। তিন কুড়ি টাকা জোগাড় করতে পারলে মিনাজদ্দী মাতব্বর তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে দেবে। এই আশায় সে সঞ্চয় করে। শেষ পর্যন্ত তার একটা বিয়েও হয়। তার জন্য পনের টাকা কর্জ করতে হয় শরৎ সাহার কাছ থেকে। তারপর সৎ পরিশ্রমের বিনিময়ে সে চাষের জমির মালিক হল, দুটি সন্তান নিয়ে শান্তির সংসার বাঁধল। কিন্তু বিপদ এল সেই বিয়ের জন্য ধার করা পনের টাকার ছিদ্র পথে। শরৎ সাহার নালিশে আজাহেরের জমি ঘর সম্পত্তি সব ক্রোক হয়ে আজাহের আবার 'পুনর্মূষিকোভব'। এবং তার সঙ্গে এক স্ত্রী ও দুই সন্তান। গ্রামের মানুষের পরামর্শে আজাহের বিশ মাইল দূরে তাম্বুলখানা গ্রামে গিয়ে অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পায় গরীবুল্লা মাতব্বরের ঔদার্যে—শুধু আশ্রয় নয়, স্নেহ প্রীতি সব। আবার শুরু হয় সংগ্রাম। আজাহের বুঝতে পারে তার বারংবার বিপর্যয়ের এক বড় কারণ অশিক্ষা। তাই সে বছিরকে লেখাপড়া শিখতে পাঠশালায় পাঠায়। এর মধ্যে কলেরায় হঠাৎ মেয়ে বড়ু মারা যায়। কিশোর বছির প্রতিজ্ঞা নেয় বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুর সুরাহা করতেই হবে। সেই প্রতিজ্ঞা

নিয়ে বছির ফরিদপুর শহরে পড়তে আসে। এই খানেই প্রথম পর্ব শেষ। তারপর বছিরের সংগ্রাম। দারিদ্র্য, অবহেলা আর তার সঙ্গে জোটে প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়া মুসলমান প্রধানদের অত্যাচার। এরই মাঝে সে স্নেহ পায় এক ফকিরের। নানা পথ বেয়ে বছিরের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সত্য হয়। এই হল উপন্যাসের মোটামুটি কাহিনী। অস্বীকার করার উপায় নেই যে কাহিনী সরল ও দুর্বল। কবি জসীমউদ্দীনের কাছে সার্থক উপন্যাস প্রত্যাশা না করাই সংগত। এই উপন্যাসের প্রধান সম্পদ কয়েকটি চিত্র ও চরিত্র।

সে ছবি আঁকাতেও কোথাও ভাষার কৃত্রিম প্রয়াস নেই। গরীবের সংসারের ছবি। সেখানে জটিল আয়োজন বা কৃত্রিমতার সুযোগ কোথায়। আজাহেরের বউ যেমন অধিক ভণিতা না করে তার সন্তান সম্ভাবনার কথা স্বামীকে জানায়, আজাহেরও চীৎকার করে পাড়া মাত করে সে কথা সবাইকে জানায়—এর মধ্যে এক অপূর্ব সারল্য প্রকাশ পায়। এই হল আনন্দের দৃশ্য। আবার দুঃখের দিনেও কোথাও কৃত্রিম উচ্ছ্বাস নেই। আজাহের স্ত্রী সন্তান নিয়ে চিরকালের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই দেখে—

"মোড়ল কান্না রাখিতে পারিল না।...মোড়ল-গিন্নী তার আঁচল হইতে কয়েকটি বীজ বাহির করিয়া আজাহেরের বউকে দিতে দিতে বলিল, "বউ! হুনছি, সে ঘন-জঙ্গলের দ্যাশে কিছুই পাওয়া যায় না। এই চালকুমড়ার বীজ কয়টা দিলাম, কোনোখানে বুইনা দিস। সেই গাছে যহন চাল কুমড়া ধরবি তখন তোর এই বুবুরে মনে করিস। আর এই সোয়া স্যার কুসুম ফুলের বীজ দিলাম। আজাহেরেরে কইস মাঠে যেন বুইনা দেয়। চৈত্র মাসে রঙীন অয়া যহন কুসুম ফুল ফুটবি, তহন সেই ফুল দিয়ে তোর ম্যায়ার শাড়ী খানা রাঙা কইরা দিস।" কি সামান্য বীজের অসামান্য দান!

এ ছাড়া আছে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পণ্য দ্রব্যের বর্ণনা। আজাহের 'একটি জলিতে ঢেঁকিশাক, দুই তিনখানা মৌমাছির চাক, সুপারি, কুমড়ার ফুল, কয়েকটা কলার মোচা সাজাইয়া ছেলের মাথায় দিল। বাঁকের দুই ধারে আটকাইয়া সে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল কাঠের বোঝা।' কোথাও বাহুল্য নেই, প্রাচুর্য নেই অথচ বাস্তবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ছবিগুলি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। বউ টুবানী ফুল, শ্রীচন্দনের লতা (চিচিঙ্গার যে 'শ্রীচন্দন' বলে এমন সুন্দর নাম আছে শহরে বাস করে ভুলেই গিয়েছিলাম) পূর্ববাংলার জল জঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে দেশ আমরা হারিয়েছি কিন্তু আজও মনে হয় ফরিদপুরের সেই তাম্বুল-

খানা গ্রামের মানুষ আর প্রকৃতি হয়তো একই রকম আছে।

মিনাজদ্দী মাতব্বর, রহিমদ্দী কারিকর, গরীবুল্লা মাতব্বর, আরজান ফকির এরা এত বেশি ভালো মানুষ যে মাঝে মাঝে মনে হয় লেখক বুঝি আমাদের রূপকথা শোনাচ্ছেন। ভালো মানুষের দিন শেষ হয়েছে। হয়তো এমন দিনও আসবে যেদিন মানুষের মৃত্যুতে মানুষ কাঁদলেও এক অভূতপূর্ব দৃশ্য বলে খবরের কাগজে ছাপা হবে। ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থার নিষ্ঠুর চাপে আমরা প্রতিদিনই আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বৃত্তিগুলিকে হারাচ্ছি। তাই যারা এখনও সহজ সততা রক্ষা করে চলেছে তারা আমাদের কাছে রূপকথার মানুষ হয়ে পড়েছে। বোবা কাহিনীতে দুঃশীল চরিত্রও আছে—শরৎ সাহা, কাজী সাহেব, রমিজদ্দীন উকীল, মওলানা শামসুদ্দীন সাহেব। বিশেষ করে রমিজদ্দীন উকীল মওলানা সাহেবের চরিত্রে মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশের ঘটনাটি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক বিষ যে উপর মহলের আমদানী তার ইঙ্গিত এই উপন্যাসে যথার্থভাবে দেওয়া হয়েছে।

জসীমউদ্দীনের বোবা কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ আর একখানি বইয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। সেটি তাঁর আত্ম-কাহিনী 'জীবন কথা'। এর প্রথম খণ্ডটি ১৯৬৪ সালে ঢাকা পলাশ প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে। জীবন কথার বিশদ পরিচয় দেওয়া হল না। কেবল এর উৎসর্গ পত্রটির অন্য তাৎপর্য আছে বলে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। উৎসর্গে জসীমউদ্দীন লিখছেন

'সুসাহিত্যিক বন্ধুবর আমীর হোসেন চৌধুরী, ঢাকা রায়ের বাজারের জিন্নাত আলী মাস্টার ও তাঁহার পরিবার প্রমুখ যে সকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তি গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করিতে যাইয়া জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এবং দেশের চারিদিকে শতে-সহস্রে যাঁহারা জান-মাল বিপন্ন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমন করিয়াছেন তাঁহাদের হাতে অতি শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১।'

মৃত্যুমাত্রেই আমরা বেদনা অনুভব করে থাকি। মৃত্যুমাত্রেই আমরা অভাব বোধ করে থাকি। মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্রেই আমরা মৃত্যুজনিত ক্ষতিকে অপূরণীয় বলে ঘোষণা করি। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে দেখা যায় যে আমাদের এই অনুভূতি ও ঘোষণা বহুলাংশে সাময়িক ও সামাজিক। আমাদের সযত্ন অনুশীলিত সৌজন্য-বোধ মৃত্যুমাত্রেই মৃত ব্যক্তির প্রশংসার ভূমি সন্ধানে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিক্রমও ঘটে থাকে, এমন কি মিথ্যাচারও করা হয়। আজীবন স্বৈরাচারী মরণান্তে হৃদয়বান বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নামান্তরিত হন, নিকৃষ্ট স্বার্থপরেরও গোপন দানের সরব উল্লেখ করা হয়। তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত স্মরণ-প্রবন্ধ ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়নে বিশ্বাসঘাতক। বিদ্যাপতি বলেছিলেন, 'গুণই তে দোস গুণলেস না পাওবি।' আমাদের স্মরণ-প্রবন্ধে মৃত ব্যক্তির দোষ লেশও পাওয়া যায় না। হয়তো দোষ উল্লেখের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় স্মরণ-প্রবন্ধ। কিন্তু মিথ্যাচার, অতিরঞ্জন—তারই কি যথার্থ মুহূর্ত ওই অশৌচ কাল?

এ সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুমাত্রেই আমাদের মিথ্যাচারী করে—মিথ্যা প্রশংসা করতে হয় না এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে কম বলেই। তাই সত্য-বাদিতার ঔদ্ধত্য নিয়েও যদি কোনো মৃতব্যক্তির দোষ সন্দর্শন সম্ভব না হয় তবে সে চরিত্র আমাদের বিস্মিত করে। এমন বিস্ময়কারী মানুষের সংখ্যা সংসারে ক্রমে আসছে যাদের মৃত্যুর পর নির্ভেজাল প্রশংসা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

আমৃত্যু যাঁরা সগর্জন প্রশংসা পেয়ে থাকেন তাঁদের সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে famous man—নামী মানুষ। এঁরা বর্তমানের হাটে ক্ষমতার পেয়াদা লাগিয়ে সুদে আসলে প্রশংসার খাজনা আদায় করেন। আর এক জাতের মানুষ আছেন যাঁরা জীবন প্রারম্ভেই বর্তমানের কলরবমুখর হাট থেকে ছুটি নিয়ে বিস্মৃতির চাদরে মুখ ঢেকে আত্মবিলোপের গহন অরণ্যে প্রস্থান করেন। এঁদের নাম দিই good man—ভালো মানুষ। লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনে মৃত্যুসহিত লুপ্তি সাধনা করেন বলে মৃত্যুর পরেই তাঁদের জীবন-আলোচনার অবকাশ ঘটে। তাই মৃত্যুর পর আলবার্ট শোআইৎসারের নাম এখানে সেখানে

ভেসে উঠছে। গৌতম বুদ্ধ বা যীশুখ্রীষ্টের জীবনদশায় জীবনী রচিত হয়েছে এমন সাক্ষ্য ইতিহাসে নেই।

আলবার্ট শোআইৎসারের নব্বই বছরের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করলে আপাত-দৃষ্টিতে তা অসামান্য বলে প্রতিভাত হবে না—কিন্তু তাঁর যে-জীবন সাধনা জীবনীর তথ্যে অপ্রকাশ্য তা কেবল অসামান্য নয় অবিশ্বাস্য। কিন্তু জীবনকথা লিখতে গেলে আমরা জীবনের তথ্যের উপরই ভরসা করি বেশি—তাই আমাদের জীবনীতে জীবন-সাধনার কথা অনুপস্থিত থাকে অনেক ক্ষেত্রে। শোআইৎসারের জীবনের ঘটনা হয়ে গেছে অপ্রাসঙ্গিক। ঘটনাকে অতিক্রম করে তিনি যে-সাধনার মাঝে বাঁচতে চেয়েছিলেন, সে-সাধনা অনায়াসে জীবনকে অতিক্রম করেছে। শোআইৎসার মৃত্যুকেও সহজে স্বীকার করেছিলেন তাই তাঁর কবরের ক্রশ চিহ্নটি তিনি নিজে হাতে বানিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাই আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আলবার্ট শোআইৎসার আর হবেন না এ সংসারে। শোআইৎসারকে স্মরণ করতে গিয়ে এই আশাই করি যেন এমন মৃত্যুর উল্লেখই আমাদের করতে হয় যে-মৃত্যু আমাদের মিথ্যাচারী করে না।

আখর-পাঠক-আসর

সাময়িক পত্রিকা কত খানি জনমত গঠন বা পাঠক রুচি ও আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা জানি না এবং সে জনমত শাসক গোষ্ঠীর উপর কতখানি কার্যকর হয় তা বলা আরও কঠিন। এ দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে ভরসা পাওয়া যায় না কোনো মতেই। তবে সাময়িক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা যদি ষাট হাজারে তুলে নেওয়া যায় এবং সে পত্রিকার যদি সত্যের প্রতি কোনো নিষ্ঠা এবং দায়িত্বের প্রতি সততাবোধ না থাকে তবে অনায়াসে পাঠকের রুচিকে ও ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করা যায় তার প্রমাণ এদেশে দেখা যাচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠা বাড়তে পারে কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, জনমতও গঠিত হয় না। এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি পাঠকের অজ্ঞতা ও দুর্বলতায়। আখর পাঠককে শ্রদ্ধা করে, পাঠকের উপর ভরসা রাখে। তাই সে পাঠকের চিন্তা শক্তিকে সমৃদ্ধ করতে চায়। আখর চায় পাঠক চিন্তা করুক। যাতে পাঠকের আপন আদর্শ পাঠক নিজেই খুঁজে পায়।

এদেশের বর্তমান সামগ্রিক দৈন্য দুর্দশা দেখে অনেকেই মন্তব্য ক'রে থাকেন, 'আগেকার দিকে এমন ছিল না! 'অর্থাৎ অতীতের সুদিনের কথা অনেকেই স্মরণ করেন। এবং অনেকে বলে থাকেন, 'সৎ আদর্শ ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এ যুগের দুর্দশা দেখা দিয়েছে।' মন্তব্যটির মাঝে কিছুটা অবৈজ্ঞানিকতা রয়ে গেছে। সমাজের অর্থনৈতিক গঠন ও স্তরই দুর্দশার মূল কারণ। তা সত্ত্বেও সমাজ জীবনে সৎ আদর্শ ও সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। নেতৃত্বের প্রয়োজন সর্বস্তরেই দেখা দেয় এবং নৈতিক সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বার্থলেশ হীনতা—নেতৃত্বের প্রাথমিক লক্ষণ। এবং এর অভাব বর্তমান কালে অত্যন্ত প্রকট। এই কারণে আমরা পিছনে তাকাই সৎ আদর্শের অনুসন্ধানে।

ভারতবর্ষের বর্তমান সংকটকে নানা জনে নানা দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে আমরা একটা প্রশ্ন রাখছি। প্রশ্নের ভিত্তিটি কাল্পনিক। কিন্তু এই সূত্রে পাঠকের চিন্তার ধারাটি স্পষ্ট হবে এই ভেবে এই প্রশ্নটি রাখা হচ্ছে। পাঠকদের

কাছে অনুরোধ তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারাটিকে পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করবেন। যার ফলে পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময় সম্ভব হবে।

নীচে কয়েকটি পরিচিত নাম দেওয়া হচ্ছে। এঁরা প্রত্যেকেই উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা পুরুষ। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য নানা ক্ষেত্রে এঁরা বাংলা দেশে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। কল্পনা করা গেল এঁদের মধ্যে একজনকে আজকের দিনে ফিরে পাওয়া যাবে। আপনি কাকে নির্বাচন করবেন? রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষ চন্দ্র বসু যাঁরা একান্ত ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে—পরে অন্য সূত্রে তাঁদের প্রসঙ্গ আসবে।